বাংলার জনশিক্ষা

১৮০০-১৮৫৬

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

অমল-দার

করকমলে

সূচীপত্র

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিককার শিক্ষার বিষয় বলিতে গেলে পাঠশালার কথা স্বতঃই আমাদের মনে আসে। আজকালকার মত তখন শিক্ষার এত রকমফের ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, এমনি করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষাকে বিভক্ত করা হইত না। তখন পাঠশালাই ছিল শিক্ষার সত্যকার বনিয়াদ।

মুসলমান আমলের অন্তর্ধান ও ইংরেজ আমলের আবির্ভাব— এ দুইয়ের মধ্যবর্তী কালে সমাজে যেমন আলোড়ন উপস্থিত হয় এমনটি পূর্বে এদেশে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তখন বাংলার সামাজিক বা অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাঙিয়া যাইতে আরম্ভ করে। ইহার মধ্যে কিন্তু সাধারণের শিক্ষা-ব্যবস্থা অবজ্ঞাত হইয়া শিক্ষা-প্রীতি আদৌ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। এই সময়কার বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য যেসব লোক সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহাদের রিপোর্টে শিক্ষাব্যবস্থার বিষয় বলিয়া গিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষে বাংলাদেশে কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হইতে কি ব্যবসা-ক্ষেত্রে, কি রাজ্য-শাসন বিষয়ে বাঙালিরা ক্রমশ ইংরেজের সংস্পর্শে আসিতে থাকে। তখন ইংরেজের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইবারও প্রয়োজন হয়। বাঙালিরা কতকগুলি ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করিয়া রাখিত। ছেলেরা ছড়া করিয়া ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করিত। তখন এমন কতকগুলি স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হইল যাহাতে ইংরেজি কিছু কিছু শেখান হইত। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সে-যুগের প্রতিষ্ঠাপন্ন লোকেরা এইরূপ স্কুলেই প্রথম ইংরেজি পাঠ লইতেন।

তখনকার দিনে পাঠশালাতেই যে সাধারণে সকল শিক্ষা পাইত তাহাও নয়। শৈশব হইতে ছেলেদের নিজ-নিজ সংস্কৃতি-অনুগ শিক্ষা দেওয়া হইত। পিতামাতা ভোর বেলা শয্যাত্যাগের পূর্বে পুত্রকন্যাদের নানারূপ শ্লোক শিক্ষা দিতেন। রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন, শৈশবে তাঁহার জ্যেঠামহাশয় 'মা নিষাদ' শ্লোক তাঁহাকে মুখস্থ করাইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত, মনসামঙ্গলাদি মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি পাঠেরও খুবই প্রচলন ছিল। যাত্রা, কথকতা, কবি গান, পালা গান, পদাবলী কীর্তন, রামায়ণ গান, ভাসান গান, প্রভৃতির কোনো না কোনোটি বৎসরের প্রায় প্রতি মাসেই গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হইত। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা এইরূপে অতীত যুগ হইতে সমাজের মধ্যে অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছিল। পাঠশালা ছিল শিক্ষার বনিয়াদ, কিন্তু এই লোকশিক্ষা পাঠশালার শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিত। টোল-চতুষ্পাঠী-মাদ্রাসায় হিন্দু-মুসলমান-সংস্কৃতির উচ্চাঙ্গ সংরক্ষিত হইত। কিন্তু এইগুলি তখন উভয় সম্প্রদায়ের শ্রেণীবিশেষের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। সাধারণের শিক্ষাক্ষেত্র ছিল এই পাঠশালা।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে, আমাদের শিক্ষার বনিয়াদ এই পাঠশালাসমূহের সংস্কার সাধনান্তর ইহাদিগকে সময়োপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার বিশেষ চেষ্টা হয়। খ্রীস্টান পাদ্রীরা এই সময় নূতন ধরনের পাঠশালা স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিরাও নব্যশিক্ষার প্রচারকল্পে পাঠশালাকেই আশ্রয় করেন। এইসকল কথাই এখানে পর পর বলা যাইতেছে। এইসকল বিষয়রচনায় সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র, সরকারী শিক্ষা-বিবরণী, শিক্ষা-বিষয়ক বিবরণের অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি এবং প্রামাণিক পুস্তকাদির উপরই বেশির ভাগ নির্ভর করিয়াছি।
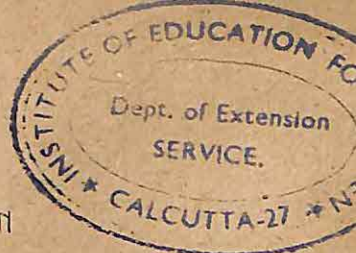
জনশিক্ষায় লর্ড ময়রা

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনন্দ অনুসারে ভারতবাসীদের প্রাচ্যবিদ্যা এবং বিজ্ঞানাদি শিক্ষার নিমিত্ত আদায়ী রাজস্ব হইতে অন্যূন এক লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয় করিতে আইনত বাধ্য থাকে। ১৮১৪ সনের ৩ জুন তারিখে বিলাত হইতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষাবিষয়ক একটি নির্দেশপত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতেও তাঁহারা প্রাচ্যবিদ্যা-শিক্ষার উপর জোর দিয়া লিখিলেন যে, ভারতীয়দিগকে জ্ঞানার্জনে উৎসাহ দিবার জন্য সম্মানসূচক উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্যও করা হউক। দ্বিতীয়ত উপযুক্ত পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে সংস্কৃতাদি শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং শিক্ষাদাতা পণ্ডিতগণকে রাজস্ব হইতে যোগ্য দক্ষিণা দিতে হইবে। এই নির্দেশপত্রে জনশিক্ষা বা জনসাধারণের শিক্ষার কোনো আভাস দেওয়া হয় নাই। ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড ময়রা (১৮১৩-২২) কিন্তু জনশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ১৮১৫ সনের ২ অক্টোবর একটি মন্তব্যলিপিতে লিখিলেন :

The humble but valuable class of schoolmasters claims the first place in this discussion. These men teach the first rudiments of reading, writing and arithmetic for a trifling stipend which is within reach of any man's means, and the instruction which they are capable of imparting, suffices for the village zeemeendar, the village accountant and the village shop-keeper.

As the public money would be ill-appropriated in merely providing gratuitous access to that quantum of education which is already attainable, any intervention of Government either by superintendence, or by contribution, should be directed to the improvement of existing tuition, and to the diffusion of it to places and persons now out of its reach. Improvement and diffusion may go hand in hand; yet the latter is to be considered matter of calculation while the former should be deemed positively incumbent.[১]

এদেশে শিক্ষার, বিশেষত জনশিক্ষার, ইতিহাসে লর্ড ময়রার এই উক্তি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পরবর্তী কালে উইলিয়ম অ্যাডাম দেশীয় পাঠশালার সংস্কারসাধন করিয়া তাহার উপর আমাদের জাতীয় শিক্ষার সৌধ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, একথা পরে বিশদভাবে বলিব। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দেই লর্ড ময়রা কিন্তু দেশীয় পাঠশালাগুলির গুণাগুণ উপলব্ধি করিলেন এবং ইহার উন্নতি ও প্রসারের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া উক্ত মন্তব্যলিপি লিখিলেন। তিনি এই মর্মে লিখিলেন যে, পাঠশালার শিক্ষা তত্ত্বাবধান ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এবং ইহার উন্নতিসাধনের নিমিত্ত, অধিকন্তু যেসব স্থলে পাঠশালা নাই সেসব স্থলে পাঠশালা প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকারী কোষাগার হইতে অর্থ ব্যয়িত হওয়া একান্ত উচিত। পাঠশালার উন্নতি ও প্রসার দুইই আবশ্যক, কিন্তু ইহার উন্নতিকল্পে এখনই কার্য আরম্ভ হওয়া দরকার।

ভারতবাসীর শিক্ষা ব্যাপারে পরবর্তী দশ বৎসর কাল সরকার পক্ষে উল্লেখযোগ্য কিছুই করা হয় নাই। লর্ড ময়রার আন্তরিকতাপূর্ণ আবেদন সত্ত্বেও জনশিক্ষার প্রচারে কর্তৃপক্ষ বরাবর উদাসীনই ছিলেন। এই

১ *Selections from Educational Records, Part I (1781-1839)*—Sharp. পৃ. ২৪

সময়ের মধ্যে বেসরকারী ভাবে কলিকাতায় ও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারোদ্দেশ্যে নানারূপ চেষ্টার সূত্রপাত হয়। এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হইলেন খ্রীস্টান পাদ্রীগণ। ১৮১৩ সনের সনন্দে তাঁহারা ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষের সর্বত্র অবাধ গতিবিধির অধিকার লাভ করিলেন। তাঁহারা প্রথমে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে স্থানে স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, বালক-বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম প্রথম খ্রীস্টধর্মবিষয়ক পুস্তক পড়ানো হইত না। চুঁচুড়ার পাদ্রী রবার্ট মে, বর্ধমানে চার্চ মিশনরী সোসাইটির সহায়তায় ক্যাপটেন জেম্‌স স্টুয়ার্ট এবং শ্রীরামপুর মিশনের কার্য এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উন্নত বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রদত্ত জনশিক্ষার কথা বলিতে গেলে ইঁহাদের কার্যকলাপের বিষয়ই আগে বলা আবশ্যক।

রবার্ট মে-র পাঠশালা

পাদ্রী রবার্ট মে ১৮১৪ সনের জুলাই মাসে 'বেল'পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিবার জন্য চুঁচুড়ায় নিজ বসতবাটীতে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করেন। পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যাওয়ায় অগস্ট মাসেই স্থানীয় ব্রিটিশ কমিশনার গর্ডন ফোর্বসের সাহায্যে দুর্গের মধ্যে একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে ইহা স্থানান্তরিত করা হইল। অক্টোবরের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা বর্ধিত হইয়া বিরানব্বই জনে দাঁড়ায়। ১৮১৫ সনের জানুয়ারি মাসে নিকটবর্তী একটি গ্রামে মে সাহেব আর-একটি পাঠশালা খুলিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই তৎপ্রতিষ্ঠিত পাঠশালা সংখ্যা হইল ষোলো এবং ছাত্রসংখ্যা নয় শত একান্ন। পাঠশালাগুলির অধিকাংশই নিকটবর্তী গ্রামসমূহে স্থাপিত হইয়াছিল। পাদ্রী মে সহকারীগণসহ অনবরত পাঠশালাগুলি পরিদর্শন করিতেন ও ইহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন।

মে সাহেবের পাঠশালাগুলির দ্রুত উন্নতির যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি শিক্ষাদানে 'বেল'পদ্ধতি অনুসরণ করিলেও দেশীয় রীতি একেবারে বর্জন করেন নাই। কোনো কোনো পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা এক শত কুড়ি জন পর্যন্ত হইয়াছিল, শিক্ষক তাঁহার কার্যে সর্দারপোড়োদের সাহায্য লইতেন। প্রতি চল্লিশ জন ছাত্রের জন্য শিক্ষক পাঁচ টাকা বেতন পাইতেন। ইহার উপর প্রতি কুড়ি জন পিছু তাঁহাকে এক টাকা দেওয়া হইত। পরে, প্রতি দশ জনেই তাঁহাকে এক টাকা করিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। পাঠশালায় এক শত জন ছাত্র হইলে শিক্ষক দশ টাকা বেতন পাইতেন। এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় ছাত্র সংগ্রহে শিক্ষক উদ্বুদ্ধ হইতেন। ১৮১৭ সনে প্রতি তিনটি পাঠশালার উপরে তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পণ্ডিতগণ আবার একজন প্রধান-পণ্ডিতের অধীন ছিলেন।[২]

রবার্ট মে-র এতাদৃশ কৃতিত্ব দেখিয়া ফোর্বস সাহেব ১৮১৫ সনেই ইহা গবর্নমেণ্টের গোচরে আনিলেন। তাঁহারা মে-র কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া পাঠশালাগুলির জন্য ছয় শত টাকা মাসিক সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। সরকার পক্ষ হইতে এগুলি তত্ত্বাবধানের ভার ফোর্বসের উপর অর্পিত হইল।

দুর্গ মধ্যে বালকদের যাতায়াতের অসুবিধা হওয়ায় মে সাহেব কেন্দ্রীয় পাঠশালাটি চুঁচুড়ার অল্প দূরে স্থানান্তরিত করিলেন। ১৮১৬ সনে পাঠশালা ও ছাত্রসংখ্যা উভয়ই বর্ধিত হইল, ছাত্রসংখ্যা হইল ২,১৩৬। নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের নিমিত্ত শিক্ষক তৈরি করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া মে এই সময় একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনে অগ্রণী হন। তিনি

---

২ *Reports on the State of Education in Bengal* (*1835 & 1838*) by William Adam. University of Calcutta Edition. পৃ. ৬০-৬১। ইহা পরে 'অ্যাডাম' বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

প্রথমে কয়েক জন যুবককে শিক্ষানবিস রূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি ইহাদের খাওয়া-পরা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় নিজেই বহন করিতেন। কেন্দ্রীয় স্কুলে মনিটর বা সর্দারপোড়োরূপে তাহারা সাক্ষাৎভাবে মে সাহেবের নিকট হইতে শিক্ষাদান রীতি আয়ত্ত করিত। পরে গ্রামে গিয়া পাঠশালায় শিক্ষকতা কর্মে ব্রতী হইত। নর্মাল স্কুলটি এক বৎসর পরে উঠিয়া যায়। যাহা হউক, মে সাহেবের কার্য বিশেষ প্রসার লাভ করিলে সরকার মাসিক সাহায্য ছয় শত টাকার স্থলে আট শত টাকা বাড়াইয়া দেন।

রবার্ট মে ১৮১৮ সনের অগস্ট মাসে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। মৃত্যুকালে তৎপ্রতিষ্ঠিত পাঠশালার সংখ্যা ছিল ছত্রিশ এবং ছাত্রসংখ্যা হিন্দু-মুসলমানে ছিল প্রায় তিন হাজার। মে-র মৃত্যুর পর পীয়ার্সন ও হার্লি পাঠশালাগুলির ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারাও মে-অবলম্বিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, সব বিষয়ই বাংলায় শিক্ষা দেওয়া হইত। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তকসমূহ এখানে পড়ানো হইত।

১৮২১-২২ খ্রীস্টাব্দে পাঠশালাসংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলেও ছাত্রসংখ্যা প্রায় সমানই ছিল। ১৮২৪ সনে সরকারী শিক্ষা-সমাজ (General Committee of Public Instruction) মে-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তখন এগুলির হীন দশা। জনশিক্ষার প্রতি কর্তৃপক্ষ বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দেই তাঁহারা এগুলি সংরক্ষণের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে সুরু করিলেন। ১৮৩১ সন নাগাদ জনশিক্ষার উপর সাধারণ-ভাবে এবং চুঁচুড়া পাঠশালাসমূহের উপর বিশেষভাবে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধ মনোভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

তাঁহারা দেশীয় পাঠশালাগুলির ক্ষতি হইবার অজুহাতে এগুলি

সংকুচিত করার পক্ষে মত দিলেন।[৩] ইহার এক বৎসর পরে ১৮৩২ সনে শিক্ষা-সমাজ পাঠশালাগুলির পরিচালনা ভার Incorporated Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts নামক খ্রীস্টতত্ত্ব প্রচার সমিতির হস্তে অর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহাদিগকে এই ভার পুনরায় লইতে হইল। তাঁহারা একটি কেন্দ্রীয় বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, কিন্তু তাহাও টিকিল না। পরে, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ মহসীন প্রদত্ত অর্থ হইতে হুগলী কলেজ ও ব্রাঞ্চ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যান্য পাঠশালা তাঁহারা বন্ধ করিয়া দেন।[৪]

বর্ধমানের পাঠশালা

ক্যাপটেন জেম্‌স স্টুয়ার্ট বর্ধমানে পাঠশালা স্থাপন করিয়া নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ করেন। তিনি স্বয়ং বাংলাভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। খ্রীস্টধর্মে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং ইহার প্রচারে তিনি বিশেষ অবহিত হন। কিন্তু পাঠশালাসমূহে খ্রীস্টধর্ম শিক্ষা দিতেন না। 'বর্ণমালা', 'উপদেশ কথা', ও 'তমোনাশক' নামে বাংলা পুস্তক তিনি প্রণয়ন করেন। এক বৎসরের মধ্যেই ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে স্টুয়ার্ট দশটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অন্যূন এক হাজার ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিত। চার্চ মিশনরী সোসাইটির কলিকাতা

---

৩ *The Asiatic Journal*, December 1832. Asiatic Intelligence. পৃ. ১৬৫-৬

৪ চার্লস লাসিংটন প্রণীত *History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions founded by the British in Calcutta and its Vicinity* (published in 1824) পুস্তকের "Government Chinsurah Schools" এবং *Report of the General Committee of Public Instruction of the Presidency of Fort William in Bengal for 1838-39*, পৃ. ২০-২২ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য

শাখা (২রা ফেব্রুয়ারী ১৮১৭এ প্রতিষ্ঠিত) এই পাঠশালাগুলির পরিচালন-ভার লইয়াছিলেন। এখানকার শিক্ষাদানপদ্ধতির এরূপ সুনাম হইয়াছিল যে, কলিকাতাস্থ স্কুল সোসাইটি পাঁচ জন বাঙালি শিক্ষকসহ নিকোলাস উইলার্ডকে পাঠশালাপরিচালনব্যবস্থা ও শিক্ষাদান-রীতি আয়ত্ত করিবার জন্য বর্ধমানে প্রেরণ করেন।[৫]

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে জেটার ও ডীয়ার নামক দুই জন পাদ্রী এই পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই সময় পাঠশালাসংখ্যা তেরোটিতে দাঁড়াইয়াছিল। ইংরেজি শিক্ষার জন্য এ সময় একটি কেন্দ্রীয় ইংরেজি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথমে ছাত্রদের বাংলা ভালো করিয়া শিখিতে হইত, পরে যোগ্য ছাত্রদের ইংরেজি শিখাইবার রীতি ছিল। পাঠশালাসমূহের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য এখানে একত্র করানো হইত। জেটার ইংরেজি বিদ্যালয়ের ভার লইলেন, ডীয়ারের উপর ভার পড়িল বাংলা পাঠশালাগুলির। এখানেও স্কুল-বুক সোসাইটির পুস্তকাদি পড়ানো হইত। ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বাঙালি ছেলেরা বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিত।[৬] ১৮৩৪ সনে চার্চ মিশনরী সোসাইটি বর্ধমানে মাত্র নয়টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন।[৭]

শ্রীরামপুরের পাঠশালা

শ্রীরামপুরের মিশনরীরাও নূতন ধরনের পাঠশালা স্থাপনে তৎপর হইলেন। তাঁহাদের কার্য কতকটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। মিশনের অন্যতম পাদ্রী জশুয়া মার্শম্যান ১৮১৩ সনের শেষে শিক্ষা-বিষয়ক একটা পরিকল্পনা বিলাতে ব্যাপটিস্ট সোসাইটিকে প্রেরণ করেন। তখনও কিন্তু বিলাত

---

[৫] শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪-৫
[৬] লাসিংটন, পৃ. ৩৪, ৩৮-৪০
[৭] অ্যাডাম, পৃ. ৬৯

হইতে সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক নূতন প্রস্তাব, অর্থাৎ সরকারী রাজস্ব হইতে এদেশীয়দের শিক্ষাদানার্থ প্রতি বৎসর লক্ষ টাকা আলাদা করিয়া রাখার নির্দেশ আসিয়া পৌছায় নাই। মার্শম্যান-রচিত পরিকল্পনা হইতে জানা যায়, শ্রীরামপুর মিশন তৎপূর্বেই বিভিন্ন অঞ্চলে কুড়িটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা-বিস্তারকল্পে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে আবশ্যক— ১. পুস্তক, ২. তত্ত্বাবধান এবং ৩. অর্থ। পুস্তক সম্পর্কে মার্শম্যান লেখেন, বিদ্যালয়ে শুধু বাইবেল পড়াইলে চলিবে না, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে ভালো ভালো বিষয়ের সংকলন-পুস্তকও এখানকার পাঠ্য তালিকা-ভুক্ত হওয়া চাই। পাদ্রীগণ নিখরচায় স্কুলগুলির তত্ত্বাবধান করিবেন। কলিকাতাস্থ বেনেভোলেণ্ট ইনস্টিটিউশনে শিক্ষিত ছাত্রগণ এখানকার শিক্ষকতা-কার্যে স্বল্প বেতনে নিযুক্ত হইবেন। চল্লিশ জন ছাত্রের একটি স্কুলের ব্যয়— শিক্ষকের বেতন, বাড়িভাড়া ইত্যাদি বাবদে দশ টাকার বেশি পড়িবে না। এরূপে প্রতিমাসে হাজার টাকা ব্যয়ে চারি হাজার ছাত্রের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। সে-যুগের আর্থিক মানদণ্ডে ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব হইত। কেরি-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের জীবনীকার বলেন, এদেশীয়দের শিক্ষা সম্পর্কে এতাদৃশ কার্যকর পরিকল্পনা মার্শম্যানের পূর্বে আর কেহ রচনা করেন নাই।

মার্শম্যান এই পরিকল্পনা রচনা এবং বিলাতে প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহার যত্নে শ্রীরামপুরে শিক্ষক তৈরীর জন্য একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। চারি দিকে পাঠশালাও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় নবাবগঞ্জে। স্থানীয় লোকেরাও মিশনরীদের এই কার্যে বিশেষ সহায় হইলেন। স্কুলের জন্য কেহ বিনা ভাড়ায় ঘর দিলেন, কেহ চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়িয়া দিলেন। নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান হেতু ছেলেরা অল্প সময়ে শিক্ষায় বেশ উন্নতি করিতে লাগিল। বহুদূর

হইতে লোকজন আসিয়া তাহাদের অঞ্চলেও যাহাতে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয় তার অনুরোধ জানাইত। মাতৃভাষার মাধ্যমেই সর্বত্র শিক্ষা দেওয়া হইত।

বিলাতে শিক্ষা-বিষয়ক পরিকল্পনা প্রেরণের পর দুই বৎসর যাবৎ যে ধরনে কার্য পরিচালিত হয়, তার নিরিখে জশুয়া মার্শম্যান ১৮১৬ সনে *Hints relative to Native Schools together with the outline of an Institution for their extension and management* নামে শিক্ষা-বিষয়ক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাখানি প্রকাশে ভারতের এবং বিলাতের বিদগ্ধ সমাজে ও শিক্ষা-ব্রতীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়ে। বঙ্গদেশের তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা, শিক্ষার বাহন, পুস্তকাদি প্রকাশ ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের উপায়— পূর্বোক্ত পরিকল্পনায় যেসব বিষয়ের অবতারণা মাত্র করা হয়, মার্শম্যান *Hints*এ তার বিশদ আলোচনা করেন। শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত এখানে সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বলেন, মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা নিছক বাতুলতা মাত্র। জগতের সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান এই মাতৃভাষার মাধ্যমেই বঙ্গ-সন্তানদের পরিবেশন করিতে হইবে। পাঠ্য-পুস্তকের অভাব আপাতত ইহার প্রতিবন্ধক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ছেলেদের শিক্ষাদানে তখন যে নূতন পদ্ধতি অনুসৃত হইতে আরম্ভ হয় তাহাতে এ বাধা অতি সহজেই অতিক্রম করা যায়। বর্ণমালা, যুক্তাক্ষর, অঙ্ক প্রভৃতির জন্য চার্ট তৈরী করিয়া মুদ্রণ করা হয়। এই চার্টের সাহায্যে বহু ছাত্র একসঙ্গে এ সকল লিখিতে পারিবে, পুস্তকের অভাব মিটিবে, ব্যয় বাহুল্যও থাকিবে না। মার্শম্যান প্রায় দেড়-শ বৎসর পূর্বে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন— একবার ইংরেজী শিখিলে চাষীর ছেলে লাঙ্গল ছাড়িবে, হাতের কাজও আর করিতে চাহিবে

না। মার্শম্যানের উক্তির যথার্থতা পরে আমরা সম্যক্ অনুভব করিয়াছি।

Hints প্রকাশের বৎসরখানেকের মধ্যেই শ্রীরামপুরের চতুর্দিকে কুড়ি মাইলের ভিতর অন্যূন পঁয়তাল্লিশটি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল। সর্বসাকুল্যে দুই সহস্র ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিত। এইসব ছাত্রই পরে ইংরেজি শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।[৮]

শ্রীরামপুর মিশন ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর মিশনের জনশিক্ষা প্রচেষ্টা ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে ইহার তত্ত্বাবধানে একুশটি বালক-বিদ্যালয় ছিল, ছাত্রসংখ্যা ছিল এগার শত পঁচানব্বই। এসব বিদ্যালয়ে ইংরেজি বাংলা ও ফার্সি শক্ষা দেওয়া হইত।

পাশ্চাত্য রীতিতে জনশিক্ষা প্রবর্তনে মিশনরীদের কৃতিত্ব ভুলিবার নয়। জনশিক্ষার ইতিহাসে তাঁহাদের কার্যের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। কিন্তু তাহাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হইয়া দেশীয় পাঠশালাসমূহের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হয় নাই। তাঁহারা নূতন পাঠশালা স্থাপন করিতে গিয়া স্থানে স্থানে দেশবাসীর ঈর্ষারও কারণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পাঠশালা অবৈতনিক হওয়ায় লোকে এখানেই বালকদের প্রেরণ করিত। ফলে ঐসব অঞ্চলের বহু দেশীয় পাঠশালা উঠিয়া যায়।

---

৮ *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward etc.* by John Clarke Marshman. Vol. II. 1841.
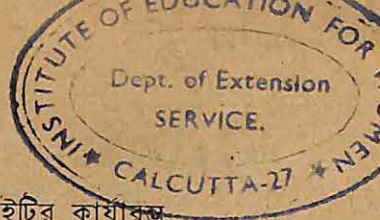
কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্যারম্ভ

চুঁচুড়া বর্ধমান ও শ্রীরামপুর অঞ্চলের পাদ্রীদের খণ্ড প্রচেষ্টা দ্বারা বড়লাট লর্ড ময়রার প্রস্তাব-অনুরূপ কার্য হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। কলিকাতা স্কুল সোসাইটি উহা কার্যে পরিণত করিতে যত্নপর হইলেন। ১৮১৭-১৮ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গবাসীদের শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় পর পর তিনটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়— ১. সুষ্ঠুভাবে ইংরেজি শিক্ষাদানের জন্য হিন্দু কলেজ, ২. পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রচারোদ্দেশে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি, এবং ৩. প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য কলিকাতা স্কুল সোসাইটি। জনশিক্ষার প্রসার ও উন্নতি কল্পে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটির কার্য বহুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। প্রধানত কলিকাতা স্কুল সোসাইটির মারফতই এইসব উদ্দেশ্যে কাজ চলিতে থাকে। কাজেই ইহার কার্যকলাপের কথাই এখানে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি স্থাপিত হয় ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই তারিখে। কিয়ৎকাল মধ্যেই ইহার কর্তৃপক্ষ অনুভব করিলেন যে, দেশীয় পাঠশালাগুলির অবস্থার সংস্কার না হইলে তাঁহাদের পাঠ্য পুস্তক গ্রাহ্য হইবার আশা অতি অল্প। এইজন্য সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বৎসর পরে ২৪ জুলাই ১৮১৮ তারিখে সদস্যগণ একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য কলিকাতায় একটি স্কুল সোসাইটিও প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। প্রস্তাবিত সোসাইটির নিয়মাবলীও এই সভায় রচিত হইল।

পরবর্তী ১ সেপ্টেম্বর উক্ত উদ্দেশ্যে কলিকাতা টাউন হলে একটি

প্রকাশ্য সভা হয়। সভার সভাপতি হইলেন সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জে. এইচ. হেরিংটন। উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী সম্বলিত মূল প্রস্তাব উত্থাপিত করেন সুপ্রিম কোর্টের (পরবর্তীকালে, হাইকোর্ট) প্রধান বিচারপতি সার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট। সোসাইটির উদ্দেশ্য মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত হইল— ১. কলিকাতার দেশীয় (indigenous) পাঠশালাসমূহের উন্নতি সাধন, ২. আদর্শ ইংরেজি ও বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এবং ৩. এইসব বিদ্যালয়ের যে-সকল ছাত্র পাঠে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগের জন্য উচ্চবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা। এইরূপে সোসাইটির উচ্চশিক্ষিত ছাত্রগণ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকাদি মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতে সমর্থ হইবে, সঙ্গেসঙ্গে স্বদেশীয়-দের উন্নত প্রণালীতে শিক্ষাদানেও ব্রতী হইতে পারিবে।

সভায় স্থির হয় যে, সোসাইটির অধ্যক্ষ বা কর্মকর্তৃসভায় চব্বিশ জন সদস্য থাকিবেন, তন্মধ্যে ষোলো জন ইউরোপীয় ও আট জন ভারতীয়। উইলিয়ম কেরি ও ডেভিড হেয়ার প্রথম হইতেই অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন। প্রথমে ভারতীয়দের মধ্যে মাত্র ছয় জন সভ্য অধ্যক্ষ-সভায় গৃহীত হন। তাঁহারা যথাক্রমে গবর্নমেণ্টের পার্শিয়ান সেক্রেটারীর আপিসের মীর মুন্সী মৌলবী মীর্জা কাসেম আলি খাঁ, কলিকাতা কোর্ট অফ সার্কিটের মুফ্‌তি মৌলবী ওয়ালেয়াল হোসেন, কাশীনরেশের উকীল মৌলবী দরবেশ আলি, রামপুর-নবাবের উকীল মৌলবী নুরুন্নবী, রসময় দত্ত ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই রাধাকান্ত দেব ও উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যক্ষ-সভার অবশিষ্ট দুই জন ভারতীয় সদস্য হইলেন। প্রথম হইতেই রাধাকান্ত দেব সোসা-ইটির Native Secretary বা ভারতীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। সোসাইটির ইউরোপীয় সম্পাদক হইলেন ই. এস. মণ্টেগু; দেশীয় পাঠ-শালা বিভাগের সম্পাদক হইলেন ডব্লিউ. এইচ. পিয়ার্স। পণ্ডিত গৌর-

মোহন বিদ্যালঙ্কার ইহার বেতনভোগী পণ্ডিতের কর্মে নিযুক্ত হন। তিনি পাঠশালাসমূহের পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়কের কার্য করিতেন। গৌর-মোহন স্কুল-বুক সোসাইটির কার্যে ইতিপূর্বেই লিপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রাথমিক আয়োজনাদির পর সোসাইটির কার্য আরম্ভ হইল। অধ্যক্ষ-সভা অগ্রেই প্রথম উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইলেন। ভারতীয় সম্পাদক রাধাকান্ত দেব দেশীয় পাঠশালাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিলেন। তখন কলিকাতা এরূপ বিরাট নগরীতে পরিণত হয় নাই, ইহা আয়তনে খুবই ছোট ছিল। কলিকাতার পঁয়ত্রিশটি পল্লীতে মোট পাঠশালা ছিল ১৬৬টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩,৪৮৭।[১] কার্য-সৌকর্যার্থ রাধাকান্ত কলিকাতাকে চারি ভাগে ভাগ করেন। প্রথম বিভাগের সীমানা— দক্ষিণে শার্ট্‌স্ (shirts) বাগান, উত্তরে মির্জাপুর, পূর্বে সার্কুলার রোড, পশ্চিমে চিৎপুর; দ্বিতীয় বিভাগ— দক্ষিণে পটলডাঙ্গা, উত্তরে শিমলা, পূর্বে সার্কুলার রোড, পশ্চিমে চিৎপুর; তৃতীয় বিভাগ— দক্ষিণে বড়বাজার, উত্তরে নিমতলা, পূর্বে চিৎপুর, পশ্চিমে গঙ্গানদী; চতুর্থ বিভাগ— দক্ষিণে বিষেণবাগান ও হাটখোলা, উত্তরে বাগবাজারের খাল, পূর্বে সার্কুলার রোড, পশ্চিমে গঙ্গা।

প্রত্যেক বিভাগের পল্লীর নাম ও সেখানে স্থিত পাঠশালার সংখ্যাও রাধাকান্ত দেব দিয়াছেন। প্রথম বিভাগে ৮ পল্লী ও ২৯টি পাঠশালা, যথা— কলিঙ্গা ৩, তালতলা বাজার ২, জানবাজার ৩, ডিঙ্গিভাঙ্গা ৪, চাঁপা-তলা ১, কপালিতলা ৭, বৈঠকখানা ১, মীর্জাপুর ৮। দ্বিতীয় বিভাগে ৯ পল্লী ও ৪২টি পাঠশালা, যথা— পটলডাঙ্গা ২, আরপুলি ৪, কেরানি-বাগান ২, চোরবাগান ২, কলুটোলা ৬, সুতারবাগান ৪, মেছুয়াবাজার ১,

---

[১] উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁহার প্রথম শিক্ষা-রিপোর্টে (১৮৩৫, পৃ. ৯) কলিকাতার সীমানার মধ্যে ২১১টি পাঠশালার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাদের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪,৯০৮

সিমলা ৯, জোড়াসাঁকো ১২। তৃতীয় বিভাগে ৬ পল্লী ও ৩৬টি পাঠশালা, যথা— বড়বাজার ১১, তুলাবাজার ২, পাথুরিয়াঘাটা ৯, কয়লাহাটা ১, জোড়াবাগান ২, নিমতলা ১১। চতুর্থ বিভাগে ১২ পল্লী ও ৫৯টি পাঠশালা, যথা— রাজাবাজার ১, বিষেণবাগান ১, গরানহাটা ১, চড়কডাঙ্গা ১, বটতলা ২, সুতানুটি ১০, কুমারটুলি ৬, বাগবাজার ১১, শ্যামপুকুর ৪, জামবাজার ১০, শোভাবাজার ১১, দর্জিতলা ১।

পাঠশালার ভার চারিটি বিভাগের চারি জন সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট বা তত্বাবধায়কের হস্তে অর্পিত হইল। প্রথম বিভাগের তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন মলঙ্গার দত্ত-পরিবারের দুর্গাচরণ দত্ত, দ্বিতীয় বিভাগের— আরপুলি-নিবাসী সীতারাম ঘোষের পরিবারস্থ রামচন্দ্র ঘোষ, তৃতীয় বিভাগের— জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের নন্দলাল ঠাকুর এবং চতুর্থ বিভাগের— স্বয়ং রাধাকান্ত দেব। প্রত্যেক তত্বাবধায়কের একজন করিয়া সরকার থাকিতেন। তাঁহারা প্রত্যেক পাঠশালার অবস্থার কথা তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিতেন এবং পাঠশালাসমূহে পাঠ্য পুস্তক বিলি করিতেন। সোসাইটির পণ্ডিতের কথা বলা হইয়াছে। তিনি পাঠশালা-গুলি পরিদর্শনকালে গুরুগণকে অধ্যাপনা-রীতি বুঝাইয়া দিতেন এবং ছাত্র ও গুরুদের সম্মুখে পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন। একত্রে বা পৃথকভাবে যখন যেমন সুবিধা, প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রদের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা গ্রহণও তাঁহার কর্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল।

পাঠ্য পুস্তক গ্রহণে প্রথম দিকে জনসাধারণের মনে একটি বিশেষ কারণে আপত্তি হয়। তাহাদের আশঙ্কা— পাঠ্য পুস্তকে খ্রীস্টতত্ত্ববিষয়ক কথা হয়ত রহিয়াছে। রাধাকান্ত দেব বলেন— তিনি স্বয়ং যখন এই আশ্বাস দিলেন যে, এসবের মধ্যে খ্রীস্টকথা নাই তখন তাহারা ইহা গ্রহণে আর আপত্তি করে নাই। রাধাকান্ত দেব সোসাইটির পক্ষে ১৮১৯,

১৯ এপ্রিল তারিখে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন যে, প্রতি বাংলা মাসের ২০ তারিখে ছাত্রসহ গুরুগণ আসিয়া বই লইয়া যাইবেন। তাঁহার এই আহ্বানে প্রথমে মাত্র সতেরো জন শিক্ষক নিজ নিজ ছাত্রদের জন্য বই লইয়া গেলেন। পরবর্তী ২০ জ্যৈষ্ঠ এইসব ছেলে লইয়া রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে একটি পরীক্ষা হইল এবং তাহাদের পাঠে উন্নতি দেখিয়া উপস্থিত সকলেই প্রীত হইলেন। এক বৎসরের মধ্যে ২৬৬১টি বালক সোসাইটি হইতে পুস্তক লইল। এই সময় মধ্যে পাঠশালাসংখ্যা বাড়িয়া ১৯৪টিতে দাঁড়াইল, মোট ছাত্র হইল ৩,৭৮৭ জন।

সোসাইটির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য— আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ হইতে তাঁহারা এদিকে মন দিলেন। কলিঙ্গায় শ্রীরামপুর মিশনের এবং টালায় ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের একটি করিয়া বিদ্যালয় ছিল। ১৮২০ সনে সোসাইটি এই দুইটির ভার লইলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহারা চারিটি নূতন বিদ্যালয়ও স্থাপন করিলেন। এই চারিটির মধ্যে আরপুলি-পাঠশালার ব্যয়ভার ডেভিড হেয়ার স্বয়ং বহন করিতে থাকেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনেও কর্তৃপক্ষ বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের উচ্চশিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল হিন্দু কলেজ। স্কুল সোসাইটির উদ্দেশ্যের কথা জানিয়াই হয়ত কলেজ-কর্তৃপক্ষ ১৮১৮ সনের ২৪ নবেম্বর এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, ছাত্রপ্রতি পাঁচ টাকা মাসিক বেতনে সোসাইটির কুড়ি জন ছাত্রকে কলেজে ভর্তি করিয়া লইতে তাঁহারা সম্মত আছেন। সোসাইটির জীবিত-কালে প্রতি বৎসর অনধিক ত্রিশ জন ছাত্র কলেজে অধ্যয়নের সুবিধা পাইয়াছিল। কলেজের ইউরোপীয় সম্পাদক ক্যাপ্‌টেন এফ. আর্ভিন কলেজস্থিত সোসাইটির ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলে ১৮১৯ সনের মধ্যভাগে ডেভিড হেয়ার এই ভার গ্রহণ করেন।

সোসাইটি তিনটি দিকেই কার্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ইহা খুবই ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিল। প্রতি বৎসর হাজার হাজার পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ, দেশীয় পাঠশালাগুলিকে অর্থসাহায্যদান, আদর্শ বিদ্যালয়পরিচালন এবং হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বেতন-ভার বহন —ইহার প্রত্যেকটিতেই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অথচ প্রথম পাঁচ বৎসর সোসাইটিকেই সদস্য ও অন্যান্যের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানের উপর নির্ভর করিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছে, সরকারের নিকট হইতে এক কপর্দক সাহায্যও তাঁহারা পান নাই। সোসাইটির তহবিলের উপর শীঘ্রই টান পড়িল। ১৮২২ সনে তাঁহাদিগকে আদর্শ বিদ্যালয়গুলি পরিত্যাগ করিতে হইল। ইহাদের মধ্যে তিনটির পরিচালনভার গ্রহণ করেন চার্চ মিশনরি সোসাইটি। সোসাইটির একজন মুসলমান সদস্য একটির ভার লইলেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই ইহা উঠিয়া যায়। আরপুলি-পাঠশালা পূর্ববৎ ডেভিড হেয়ারের হস্তেই রহিয়া গেল। হেয়ার ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে পাঠশালার সঙ্গে একটি ইংরেজি বিভাগ খুলেন। এই বৎসর পটল-ডাঙ্গায়ও একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। আদর্শ বিদ্যালয়গুলি তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেও, সোসাইটি এই বিদ্যালয়টির আর্থিক দায়িত্ব আংশিকভাবে গ্রহণ করিলেন, ডেভিড হেয়ার অবশিষ্ট অংশ বহন করিতেন।

সোসাইটির আর্থিক অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াছি। প্রথম বৎসরে ইহার আয় ছিল দশ হাজার টাকার উপর; দ্বিতীয় বৎসরে আয় হয় সাড়ে সাত হাজার টাকা, তৃতীয় বৎসরে ইহা কমিয়া পাঁচ হাজার টাকায় দাঁড়ায়; কিন্তু চতুর্থ বৎসরে ইহা একেবারে ২,৯৪১।৶১১ পাইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহার পরই সোসাইটিকে আদর্শ বিদ্যালয়গুলি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। এইরূপ আর্থিক বিপর্যয় উপস্থিত হইলে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ১৮২৩ সনের এপ্রিল মাসে গবর্ন-

মেণ্টের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। গবর্নমেণ্টও অতি দ্রুত তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সোসাইটি পরবর্তী মে মাস হইতেই গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক পাঁচ শত টাকা সাহায্য পাইতে লাগিলেন।

সোসাইটির কর্মকর্তাদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ অদলবদল হইল। ১৮২১ সনে ই. এস্. মণ্টেগুর স্থানে পিয়ার্স সাহেব ইউরোপীয় সেক্রেটারি হইলেন, এবং দেশীয় পাঠশালা বিভাগের ভার পড়িল ডেভিড হেয়ারের উপর। ১৮২২ সনের ৩১ ডিসেম্বর পিয়ার্স পদত্যাগ করেন। তদবধি প্রথমে অস্থায়ী ও পরে স্থায়ী ভাবে ডেভিড হেয়ারই ইউরোপীয় সেক্রেটারির কার্য করিতে থাকেন। রাধাকান্ত দেব কিন্তু বরাবর ভারতীয় সম্পাদকই রহিয়া গেলেন। তাঁহার উপরই প্রকৃত পক্ষে দেশীয় পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত ছিল।

দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতিসাধনই সোসাইটির প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং সোসাইটির পক্ষে রাধাকান্ত দেব এদিকে বিশেষ অবহিত হইলেন। ডেভিড হেয়ারও তাঁহার কার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। পূর্বে বৎসরের যে-কোনো সময়ে বালকগণ পাঠশালায় ভর্তি হইতে পারিত। এজন্য প্রতিটি পাঠশালায় যত জন ছাত্র, প্রায় ততটি করিয়া শ্রেণী ছিল। সোসাইটি নিয়ম করিয়া দিলেন যে, প্রত্যেক পাঠশালায় চারিটি করিয়া শ্রেণী থাকিবে, এবং ছাত্রগণকে বৎসরের প্রথমে নির্দিষ্ট সময়ে ভর্তি হইতে হইবে। এ ব্যবস্থায় গুরুমহাশয়গণের শ্রমের লাঘব হইয়া শিক্ষাদান কার্যে উৎকর্ষ জন্মিল। পূর্বেকার সর্দারপোড়ো প্রথাও এসব পাঠশালায় বাহাল রাখা হইল। অর্থাৎ, পাঠশালার উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রেরা নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠশিক্ষায় সহায়তা করিতে লাগিল। ইহাতেও গুরুমহাশয়ের বিশেষ সাহায্য হয়। সোসাইটির পরিদর্শক— পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার পালাক্রমে প্রতিটি পাঠশালায় গিয়া গুরুমহাশয়-

গণকে অধ্যাপনা-রীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। স্কুল-বুক সোসাইটি হইতে প্রাপ্ত গণিত ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান অভিধান কাহিনী প্রভৃতি পুস্তক কিরূপে পড়িতে ও পড়াইতে হইবে উপস্থিত মতে তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতেন।

সোসাইটির পরবর্তী কার্যক্রম

পাঠশালার ছাত্রদের ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ত্রৈমাসিক পরীক্ষাগুলি সাধারণত বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক-দের গৃহেই সম্পন্ন হইত। বার্ষিক পরীক্ষা হইত কিন্তু বরাবর শোভা-বাজারে রাধাকান্ত দেবের ভবনে। ছাত্রদের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা হয় ১৮২০ সালে। মোট ৩,৭৮৭ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ২৫২ জন পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হয়। এরূপ তারতম্যের কারণ উচ্চতম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ছাত্রগণই পরীক্ষা দিবার অনুমতি-পত্র (ticket) প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজকালকার মত তখনও এক প্রকার 'টেস্ট' পরীক্ষার রীতি ছিল। চতুর্থ বার্ষিক পরীক্ষা হইতে পরীক্ষার্থী নির্বাচনে কিন্তু এক অভিনব পন্থা অনুসৃত হয়। এবার নির্দিষ্ট সংখ্যা ধরিয়া উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে 'লটারি' করা হইল। এ প্রথায় চতুর্থ বার্ষিক পরীক্ষার জন্য ১৫৫ জন ছাত্র মাত্র মনোনীত হইল। ১৮২৪ সনের ২৮ এপ্রিল পরীক্ষা হয়। বুঝা গেল, পাঠশালাসমূহের ছাত্রমাত্রেই পাঠে বেশ উন্নতি করিতেছে। এই প্রথা প্রবর্তনের কৃতিত্ব ডেভিড হেয়ারের। বার্ষিক পরীক্ষায় আরপুলি-পাঠশালার ইংরেজী বিভাগের, পটলডাঙ্গা স্কুলের এবং হিন্দু কলেজে অধ্যয়নরত সোসাইটির ছাত্রদেরও যোগ দিতে হইত। চতুর্থ বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হইবার পর ১৮২৪, ৮ জুলাই প্রদত্ত রিপোর্টে ভারতীয় সেক্রেটারি-রূপে রাধাকান্ত দেব সোসাইটিকে এই মর্মে লেখেন :

"সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত পাঠশালাসমূহের শিক্ষার উপকারিতা আমার স্বদেশবাসীরা এখন বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। ছেলেদের শিক্ষক, অভিভাবক যাঁহারা পূর্ব্বে শঙ্কান্বিত হইয়া পাঠ্য পুস্তক গ্রহণ করিতে নারাজ ছিলেন তাঁহারাও এখন সোসাইটিভুক্ত হইবার জন্য লালায়িত। সোসাইটির প্রারম্ভকালে আমি মাত্র ষোল কি সতর জন গুরুকে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করাইতে ও পরবর্ত্তী ১৮১৯ সনের ২রা জুন এইসব পুস্তকের উপর ছেলেদের পরীক্ষা দেওয়াইতে এই বলিয়া রাজি করাইয়াছিলাম যে, ইহাতে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বিষয় লিপিবদ্ধ নাই। তখন কলিকাতায় ১৬৬টি পাঠশালা ছিল। আমি শহরটি চারি ভাগে ভাগ করিয়া চারি জন তত্ত্বাবধায়কের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এই পাঠশালাগুলির মধ্যে ৮৫টি এখন পর্য্যন্ত সোসাইটির আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি শীঘ্রই করিবে। কলিকাতায় ইতিমধ্যে কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় সোসাইটির ত্রিশটি পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে।"

এ সময় ত্রিশটি পাঠশালা উঠিয়া গেলেও ইহার অল্প দিন পরেই সোসাইটির আনুকূল্যে দশটি নূতন পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল। ডেভিড হেয়ার এ বিষয় পরবর্তী ১১ জুলাই সোসাইটিকে বিজ্ঞাপিত করেন।

পাঠশালা বিভাগের কার্য বাড়িয়া যাওয়ায় একজন পরিদর্শক পণ্ডিতের পক্ষে সমুদয় পাঠশালা পরিদর্শন করা আর সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং ঐ রিপোর্টে রাধাকান্ত দেব চারি জন সহকারী পরিদর্শক-পণ্ডিত নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন। অধ্যক্ষ-সভা ১১ অক্টোবর এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সহকারী চতুষ্টয়ের মাসিক বেতন মোট পঞ্চাশ টাকা ধার্য হইল। রাধাকান্ত দেব ও ডেভিড হেয়ার যুগ্মস্বাক্ষরে শিক্ষক, পরিদর্শক-পণ্ডিত ও অন্যান্য কর্মচারীদের কর্তব্য সম্বন্ধে এই মর্মে আদেশ

দিলেন যে, পাঠশালার শিক্ষকগণকে সম্পাদক ও প্রধানপণ্ডিতের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষা দিতে হইবে। পরিদর্শক-পণ্ডিতগণ প্রত্যেকে সরকার সঙ্গে করিয়া প্রতি সপ্তাহে অন্তত ২৪টি পাঠশালা পরিদর্শন করিবেন এবং প্রত্যেকটিতে অন্যূন দেড় ঘণ্টাকাল থাকিয়া শিক্ষক ও ছাত্রগণকে পাঠ দিবেন ও পরীক্ষা করিবেন, ইত্যাদি।

এতাদৃশ ব্যবস্থা বলবৎ হইবার পূর্বেই কিন্তু শিক্ষকদের অধ্যাপনা-রীতি শিখাইবার প্রতি বিলাতে কোম্পানির ডিরেক্টরদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বড়লাট সোসাইটিকে যে অর্থসাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন তাহাতে সম্মতি দান প্রসঙ্গে তাঁহারা ইহার বিশেষ প্রশংসা করিলেন।

হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্রই এইসকল পাঠশালায় অধ্যয়ন করিত। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র মক্তব বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এ সময় ছিল বলিয়া জানা যায় না। পাঠশালায় তাহারা প্রাথমিক শিক্ষা হিন্দুদের সঙ্গে একত্রেই লাভ করিত। তবে হিন্দু ছাত্র অপেক্ষা মুসলমান ছাত্র সংখ্যায় কম ছিল।

স্কুল সোসাইটি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে অগ্রণী হন নাই। কারণ তখনও বালিকাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে সাধারণের আপত্তি ছিল। নিজেরা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না করিলেও অন্যভাবে কর্তৃপক্ষ স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করিতেন। তখন বালিকাদের শিক্ষার জন্য ইউ-রোপীয় মহিলারা বিভিন্ন মিশনরি সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। প্রথম প্রথম সেখান হইতে ছাত্রীগণ আসিয়া রাধাকান্ত দেবের ভবনে সোসাইটির পক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পরীক্ষায় যোগ দিত।

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের পর দুই বৎসর যাবৎ বার্ষিক পরীক্ষা আর গৃহীত হয় নাই। সোসাইটির ছাত্রদের পঞ্চম বার্ষিক পরীক্ষা হয় ১৮২৭ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি। এবারে দেশীয় পাঠশালাসমূহ হইতে ১২০ জন এবং

পটলডাঙ্গা স্কুল, আরপুলি-পাঠশালা ও হিন্দু কলেজ প্রত্যেকটি হইতে ত্রিশ জন মোট ২১০ জন ছাত্র পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হয়। পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার পাঠশালার ছাত্রদের পরীক্ষা লইলেন। অন্য ছাত্রদের পরীক্ষা করেন ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসন, ডক্টর উইলিয়ম কেরি এবং ডেভিড হেয়ার।

এবারকার পরীক্ষা-অন্তে একটি নূতন বিষয় অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নরত সোসাইটির ছাত্রবৃন্দ এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলির ছাত্রগণ ইংরেজি নাটক হইতে নির্বাচিত অংশ আবৃত্তি করিয়াছিল। আবৃত্তি উপস্থিত সকলের বেশ মনোজ্ঞ হয়।

১৮২৮, ১ জানুয়ারি সোসাইটিকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয় তাহাতে প্রকাশ, তখন পাঠশালা সংখ্যা কমিয়া ১৪৮টিতে দাঁড়াইয়াছিল, ছাত্র-সংখ্যা কিন্তু পূর্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল। এই সময় মোট ছাত্র ছিল ৬,১২৬ জন। সোসাইটির বিদ্যালয়গুলির কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এই একটি ব্যাপার হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়।

আরপুলি পাঠশালা ও পটলডাঙ্গা স্কুল— দুইটিই সোসাইটির আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই দুইটির বিষয় একটু বিশদভাবে বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আরপুলি-পাঠশালা ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সন্নিকটে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। ডেভিড হেয়ারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে পাঠশালাটি পরিচালিত হইত। পাঠশালাটি অবৈতনিক, শুধু দরিদ্র নিঃসম্বল ছাত্রগণই এখানে পড়িতে পাইত। ইহার যে ইংরেজি বিভাগ ছিল, তাহাতে আট বৎসরের কম বয়স্ক ছাত্রদের ভর্তি করা হইত না, কারণ মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষায় আগে তাহাদের কতকটা পাকাপোক্ত করিয়া লওয়া হইত। আবার যেসব বালক ইংরেজি শিক্ষাকালে বাংলায় অনগ্রসর বলিয়া প্রতিপন্ন হইত তাহা-দিগকেও প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া বাংলা পড়িতে হইত। নিয়মিত

উপস্থিতিতে উৎসাহ দিবার জন্য হেয়ার সাহেব এইরূপ ক্রমিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন : যে বালক মাসে এক দিনও অনুপস্থিত হইত না তাহাকে আট আনা, এক দিন অনুপস্থিত হইলে ছয় আনা ও দুই দিন অনুপস্থিত হইলে চারি আনা ; দুই দিনের বেশি অনুপস্থিত হইলে কিছুই দেওয়া হইত না। ১৮২৮ সনে আরপুলি-পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১০ জন। সোসাইটির পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্টে (১৮২৮) বলা হইয়াছে যে, এই পাঠশালাটি দেশীয় পাঠশালাসমূহের আদর্শস্থানীয়। ইহা যে কতটা জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়, নিজ নিজ সন্তানদের এখানে পড়াইবার জন্য ও-অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অত্যধিক আগ্রহ হইতে। উইলিয়ম অ্যাডাম শিক্ষাবিষয়ক প্রথম রিপোর্টে (১৮৩৫) আরপুলি-পাঠশালার শিক্ষাদান পদ্ধতি, এবং বিশেষ করিয়া এখানকার বাংলা শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লেখেন :

According to the last report, it contained about 225 boys, who were instructed by a Pandit and four Native teachers, and were divided into eleven classes, occupied with different Bengalee studies from the alphabet upwards. They were taught reading, writing, spelling, grammar and arithmetic, and the plan on which the duties of the school were conducted was nearly similar to that of an English School. In order to afford sufficient time for the boys to acquire a considerable knowledge of Bengalee before they began to learn English, no pupil was admitted into the school above eight years of age. The scholars were promoted to the Society's English School or to the Hindu College as a reward for their proficiency in Bengalee, the study of which they were required to continue until they acquired a competent knowledge of the

language. This attention to the cultivation of the language of the country, the chief medium through which instruction can be conveyed to the people, was a highly gratifying feature in the operations of the Society ; and an additional advantage of the school at Arpuly was the example which it afforded to the whole of the indigenous schools. (*Adam*, p. 13.)

পটলডাঙ্গা স্কুল ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠাকাল হইতে স্কুল সোসাইটি ও ডেভিড হেয়ার একযোগে ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন, আগে বলিয়াছি। এই বিদ্যালয়টি ক্রমে সোসাইটির আদর্শ ইংরেজি স্কুলে পরিণত হয়। সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত দেশীয় পাঠশালার ছাত্রগণ উত্তমরূপে বাংলা শিক্ষা করিয়া ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রথমে এই স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে অথবা উভয়ত্রই ভর্তি হইতে পরিত। তবে পটলডাঙ্গা স্কুল হইতেই সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদের সোসাইটির ব্যয়ে অধ্যয়নের জন্য কলেজে পাঠানো হইত। পটলডাঙ্গা স্কুল ক্রমে হিন্দু কলেজের 'প্রিপ্রেরেটরী স্কুলে' পরিণত হয়।

এই স্কুল হইতে প্রেরিত ছাত্রেরা কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য হইত। অ্যাডামের কথায় "The Society's scholars are said to rank among the highest ornaments of the College"।

সোসাইটি কর্তৃক অবলম্বিত বিবিধ ব্যবস্থায় দেশীয় পাঠশালা-সমূহের যথেষ্ট উন্নতি হইল। উৎকৃষ্ট রীতিতে পঠন-পাঠনের ফলে ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, ছাত্রেরা অধিক দিন পাঠশালায় পড়িতে লাগিল এবং শিক্ষকগণেরও আয় বৃদ্ধি পাইল। এইরূপ প্রারম্ভিক শিক্ষায় স্বদেশ-বাসীরা কিরূপ উপকৃত তাহার উল্লেখ করিয়া রাধাকান্ত দেব ১৮২৯, ২৬ জানুয়ারি সোসাইটিকে প্রদত্ত রিপোর্টের উপসংহারে এই মর্মে বলেন যে, দেশীয় পাঠশালাসমূহের পোষকতা করিয়া সোসাইটি সত্যসত্যই বিশেষ

উপকার সাধন করিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা প্রায় সকলেই এখানে অধ্যয়নে রত। সোসাইটির তত্ত্বাবধানের ফলে দেশীয় পাঠশালা-গুলির বিশেষ উন্নতি হইতেছে। এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি অব্যাহত থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সোসাইটির পরিণতি

স্কুল সোসাইটির কার্যক্রমের কথা আলোচিত হইয়াছে। সোসাইটির শিক্ষা-প্রচেষ্টার মধ্যে তিনটি স্তর লক্ষণীয়— ১. দেশীয় পাঠশালাসমূহের মারফত প্রাথমিক শিক্ষা, ২. পটলডাঙ্গার মত আদর্শ বিদ্যালয়ের মারফত মাধ্যমিক শিক্ষা, এবং ৩. হিন্দু কলেজে ছাত্র প্রেরণ দ্বারা উচ্চতম শিক্ষা। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন মনে করি। সে-যুগে মাধ্যমিক শিক্ষা, বলিয়া আলাদা কোনো নাম ছিল না। প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা এই দুই বিভাগই ছিল। যাহা হউক, একাদিক্রমে দশ বৎসর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষাকার্য পরিচালিত হওয়ায় তাহার ফলও শীঘ্রই সমাজদেহে অনুভূত হইতে লাগিল। রাধাকান্ত দেবের উক্তি ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সোসাইটির পঞ্চম রিপোর্টেও প্রকাশ, ছেলেরা বিদ্যাভ্যাস করিয়া সরকারী বা সওদাগরী চাকুরিতেই লিপ্ত হয় নাই, তাহারা বিভিন্ন মণ্ডলীভুক্ত হইয়া নানা সভাসমিতির অনুষ্ঠান করিতেছে, নির্ভয়ে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করিতেছে, সাহিত্যসেবায় মন দিতেছে, অনুবাদকার্যে রত হইয়াছে, এবং শিক্ষাপ্রচারেও ব্রতী হইতেছে।

বড়ই দুঃখের বিষয়, এমন একটি হিতকারী প্রতিষ্ঠানের কার্য অর্থাভাবে ১৮৩৩ সনেই একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। শুভ কার্যের বিপদের অন্ত নাই। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের পর হইতে সোসাইটি নানারূপ বিপদ আপদের সম্মুখীন হইতে থাকে। প্রতিষ্ঠা অবধি সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ

জোসেফ ব্যারোটা কোম্পানি ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল দেউলিয়া হয় এবং সোসাইটির গচ্ছিত ৩,৯৩৭ টাকা নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর আয়-ব্যয় সামঞ্জস্য করা দায় হইয়া উঠিল। সোসাইটি যখন ১৮২৮ সালে অর্থাভাবে বিপন্ন তখন ডেভিড হেয়ার ছয় হাজার টাকা দিয়া ইহাকে একবার দায় মুক্ত করেন। জোসেফ ব্যারোটা কোম্পানির পর সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন ম্যাকিণ্টষ কোম্পানি। এই কোম্পানিও ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে দেউলিয়া হইয়া যায়। ইহাতে সোসাইটির যাহা কিছু সামান্য অর্থ গচ্ছিত ছিল তাহা সবই বিনষ্ট হইল। এই সময় পামার কোম্পানি, ক্রাটেণ্ডেণ্ট কোম্পানি প্রভৃতি বিখ্যাত এজেন্সি হৌসগুলিরও একে একে পতন হয়। ইহার ফলে তখন কলিকাতায় ভীষণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। সোসাইটির অধিকাংশ চাঁদাদাতাই হয় বড় বড় হৌসগুলির অংশীদার, নয় ত এসবে আমানতকারী। তাঁহাদের নিকট হইতেও সাহায্যলাভের আর আশা রহিল না। গবর্মেণ্টের মাসিক সাহায্য পাঁচ শত টাকা এবং বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও আর দুই-এক ব্যক্তির চাঁদা মাত্র তখন সোসাইটির সম্বল। অথচ খুব কম করিয়া ধরিলেও তখন সোসাইটির মাসিক ব্যয় এক হাজার নব্বই টাকা। এই অবস্থায় ইউরোপীয় সম্পাদক ডেভিড হেয়ার প্রস্তাব করিলেন যে, সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুল পরিচালনা ও হিন্দু কলেজে ছাত্রদের মাসিক বেতন ব্যতিরেকে দেশীয় পাঠশালাসমূহে সাহায্য সবই বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। তাঁহার প্রস্তাবই কার্যে পরিণত হইল। হেয়ার নিজের আরপুলি-পাঠশালাটিও তুলিয়া দিলেন। ইহার ইংরেজি বিভাগ পটল-ডাঙ্গা স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করা হইল।

ডেভিড হেয়ারের প্রস্তাবমতই কার্য হইল বটে, কিন্তু কোনো কোনো সদস্য তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এই প্রস্তাব সম্পর্কে একটি প্রতিকূল মন্তব্য পেশ করিলেন। মন্তব্যলিপিতে এই মর্মে

বলা হইল যে কলিকাতায় ইংরেজি স্কুলের অভাব নাই। ইহার সংখ্যাও অতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেশীয় পাঠশালাগুলির পক্ষে—স্কুল সোসাইটির দেশীয় পাঠশালা বিভাগ ছাড়া আর কেহই এযাবৎ মনোযোগী হন নাই। গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে যে মাসিক পাঁচ শত টাকা পাওয়া যাইতেছিল তাহা পাঠশালা বিভাগের ব্যয় সংকুলানের জন্যই প্রদত্ত হয়। সরকারী সাহায্য হইতে দুই শত টাকা পাঠশালা বিভাগের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট তিন শত টাকা হিন্দু কলেজে ছাত্রদের বেতন বাবদে ব্যয় করা হউক। ইহাতে ত্রিশ জনের পরিবর্তে ষাট জন ছাত্র কলেজে পড়িতে পারিবে। বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। রাধাকান্ত দেব দেশীয় পাঠশালাসমূহের উন্নতির যেরূপ পক্ষপাতী ছিলেন এবং ইহা রক্ষায় তিনি যেরূপ অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে মনে হয়, মন্তব্যলিপিতে তাঁহার মতই বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বস্তুত সোসাইটির পাঠশালা বিভাগের উন্নতি পক্ষে রাধাকান্ত দেবের কৃতিত্ব সর্বাধিক।

এই প্রসঙ্গে সোসাইটির প্রধান পরিদর্শক পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের নামও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সোসাইটির কার্যকলাপ বন্ধ হইয়া গেলে, ভারতীয় ও ইউরোপীয় অধ্যক্ষগণ ইহার কর্মচারীদের জীবিকার নূতন উপায় করিয়া দিতে ব্যগ্র হন। সোসাইটির উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিতে গৌরমোহন কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন, এই সময় অনেকেই তাহার উল্লেখ করেন। ইউরোপীয় সম্পাদক ডেভিড হেয়ার, সদস্য পিয়ার্স, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি সকলেই গৌরমোহনের গুণমুগ্ধ ছিলেন। গৌরমোহন পরে মুন্সেফী কার্য প্রাপ্ত হন। এ কার্যেও তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।

উইলিয়ম অ্যাডাম শেষের দিকে স্কুল সোসাইটির একজন সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন।

তিনি তাঁহার প্রথম শিক্ষা-রিপোর্টে (১৮৩৫), পৃ. ১১ লিখিয়াছেন :

Unequivocal testimony is borne to the great improvement effected by the exertions of the School Society, both in the method of instruction employed in the indigenous schools of Calcutta, and in the nature and amount of knowledge communicated ; and I have thus fully explained the operations of this benevolent Association, because they appear to me to represent an admirable model, devised by a happy combination of European and Native philanthropy and local knowledge, and matured by fifteen years' experience, on which model, under the fostering care of Government, and at comparatively little expense, a more extended plan might be framed for improving the entire system of indigenous elementary schools throughout the country.

অ্যাডাম এখানে বিশেষ করিয়া বলেন যে, দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইয়া গত পনর বৎসর যাবৎ স্কুল সোসাইটির যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়াছে তাহাকে ভিত্তি করিয়া সরকারী আনুকূল্যে স্বল্পব্যয়ে সমগ্র দেশের পাঠশালাসমূহেরই উন্নতিসাধনকল্পে একটি কার্যকরী পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব। কিন্তু অ্যাডামের এ আশা ফলবতী হয় নাই।[১০]

১০ প্রধানত কলিকাতা স্কুল সোসাইটির (১৮১৮-১৮৩৩) অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে কলিকাতায় জনশিক্ষা সংক্রান্ত অধ্যায় তিনটি লিখিত

কলিকাতায় অবৈতনিক বিদ্যালয়

উইলিয়ম অ্যাডামের তথ্যপূর্ণ 'এডুকেশন রিপোর্টে'র উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে পাইয়াছি। তিনি এই রিপোর্টে এদেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত মাত্র তিনটি অবৈতনিক এবং পাঁচটি বৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিয়াছেন যে, এরূপ আরও বহু বিদ্যালয় হয়ত রহিয়াছে যাহার সংবাদ তিনি পান নাই। বস্তুত তখন কলিকাতায় ও মফস্বলে বহু বৈতনিক ও অবৈতনিক বিদ্যালয় বর্তমান ছিল। আমরা প্রথমে এই সময়কার কলিকাতার অবৈতনিক বিদ্যালয়সমূহ সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। রাজা রাম-মোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল, ভবানীপুরস্থ জগমোহন বসুর ইউনিয়ন স্কুল, ডেভিড হেয়ার পরিচালিত পটলডাঙ্গা স্কুল (পরে হেয়ার স্কুল), চিৎপুরের গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, কলিকাতার হিন্দু-প্রধানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়— এই পাঁচটি বিদ্যালয় সে-যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহাদের প্রথম তিনটি প্রথম দিকে এবং শেষেরটি বরাবর অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। আজকাল মাধ্যমিক শিক্ষা বা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় বলিতে যাহা বুঝি এগুলি প্রায় সেই ধরনের ছিল।

ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষাদান-প্রথা এদেশে নূতন নহে। এই প্রথা যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নব্যশিক্ষা বিস্তারেও অবলম্বিত হইয়াছিল, অনেকের নিকট ইহা হয়ত নূতন ঠেকিবে। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮২৪ সনের ৮ জুলাই সোসাইটিকে দেশীয় পাঠশালাগুলি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করেন তাহাতে বলেন যে, কলিকাতায় কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহার অন্তর্ভুক্ত ত্রিশটি পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে। এই অবৈতনিক পাঠশালাগুলি কত দিন চলিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে এই ধারা যে পরবর্তী দশকে বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত যুবকগণই এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন। কলেজের বিখ্যাত ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'এনকোয়ারার' পত্রে ১৮৩১ সনের অগস্ট মাসে লেখেন যে, কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে তখন ছয়টি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকটিতেই প্রাতঃকালে ছয়টা হইতে নয়টা পর্যন্ত শিক্ষাদান চলে এবং তিন শতাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করে।[১১] হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ও কবি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তদীয় 'ঈস্ট ইণ্ডিয়ান' সংবাদপত্রে হিন্দু কলেজের ছাত্র হরচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত বেহালার একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের কার্যকলাপের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১২]

যুব-ছাত্রগণ কলিকাতার অভ্যন্তরে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনে ইতিপূর্বেই অবহিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়াছি। কলেজের অন্যতম বিখ্যাত ছাত্র এবং "আলালের ঘরের দুলাল"-প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র এই সময় নিজ ভবনে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বয়ং একটি ইংরেজি রচনায় তাঁহার নিজের এবং অন্য দুইটি বিদ্যালয়ের কথা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, "আমি এবং শারদাচরণ বসু নিজ নিজ গৃহে দুইটি বিদ্যালয় স্থাপন করি। দুইটিই প্রাতঃকালে বসিত। শিবচন্দ্র দেব, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, কালাচাঁদ শেঠ এবং রাজকৃষ্ণ মিত্র আমার স্কুলে পড়াইতেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং গোপীকৃষ্ণ মিত্র কিছুকাল এখানে পড়িয়া-

[১১] *The National Magazine* for January 1908.

[১২] *The Asiatic Journal* for May 1832 : Asiatic Intelligence, p. 19.

ছিলেন। এখানে আরও কয়েকটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মাধবচন্দ্র মল্লিক এবং আরও দুই ভদ্রলোক হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে একটি স্কুল পরিচালনা করিতেন।"[১৩]

প্যারীচাঁদ প্রতিষ্ঠিত স্কুলের আর কোনো উল্লেখ বা বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি অন্য যে দুইটি বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা ঐ সময় বিশেষ খ্যাতিলাভ করে এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রে ও শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে উল্লিখিত হয়। শারদাপ্রসাদ বসু হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্‌স্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৩১ সনের ১৫ মার্চ ১৫ শ্যামপুকুরস্থ নিজ ভবনে তিনি ইহা স্থাপন করেন। এখানকার ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক পরীক্ষাদি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত।

১৮৩৫ সনেও বিদ্যালয়টি মাত্র দুই ব্যক্তির দানে চলিতেছিল। তিন চারি জন শিক্ষক প্রায় এক শত ছাত্রকে এখানে পড়াইতেন।

১৮৩৮ সনের প্রথম দিকে সম্ভবত বিদ্যালয়টির সংস্কার সাধিত হয়। এই বৎসরের ২০ মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ইহার কথা বিশেষ-ভাবে বিজ্ঞাপিত হয়। ইহাতে স্থাপয়িতা শারদাপ্রসাদ বসু সমেত অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দের নাম এবং কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ ছিল। দ্বিতীয় শিক্ষকের নাম দেখিতেছি দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিই মনে হয় দেশবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা তালতলা-নিবাসী ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই স্কুল হইতে ডেভিড হেয়ার তাঁহাকে নিজ পটলডাঙ্গা স্কুলে লইয়া গিয়া থাকিবেন। দুর্গাচরণ পরে মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ডাক্তার হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়টি সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত ছাত্র লওয়া হইত, এবং কোনো ছাত্রকে ছয় বৎসরের অধিককাল রাখা হইত না। একটি নিয়মে আছে— মাত্র দরিদ্র বালকগণকে বিনা বেতনে

১৩ *The National Magazine* for January 1908.

পড়ানো হয়। এই সময় হইতে ইহা বৈতনিক হইয়া থাকিবে। তথাপি সাধারণের দানের উপরই বিদ্যালয়টিকে বেশির ভাগ নির্ভর করিতে হইত। কলিকাতার রক্ষণশীল ও প্রগতিপন্থী বহু ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাকে অর্থ সাহায্য করিতেন। সাহায্যকারীদের মধ্যে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ, মহারাজা কালীকৃষ্ণ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, আশুতোষ দেব, কালীকিঙ্কর পালিত, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ১৮৩৩ সনে কার্য প্রায় বন্ধ করিয়া দেওয়ায় বাংলা পাঠশালাগুলি সাহায্য ও উৎসাহের অভাবে বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, অনেকগুলি উঠিয়াও যায়। মহারাজা কালীকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় উক্ত বিদ্যালয়ের শাখাস্বরূপ শুধু বাংলা শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৩৭ সনের ১ জুন শ্যামবাজারে একটি বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্যারীচাঁদ হিন্দু ফ্রি স্কুলের উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবচন্দ্র মল্লিক ব্যতীত এই স্কুলের আরও তিন জন প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন, যথাক্রমে ভুবনমোহন মিত্র, গঙ্গাচরণ সেন এবং রাধানাথ পাল। ১৮৩১ সনের মাঝামাঝি এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিচালকগণ সকলেই হিন্দু কলেজে শিক্ষিত যুবক, কাজেই সাধারণে ইহার পরিচালনপদ্ধতিতে খুশী হইতে না পারিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, বিদ্যালয়টি ক্রমে বিশেষ উন্নতিলাভ করে। ইহার প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হয় অগস্ট মাসে। পরীক্ষাকালে ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষক ছাত্র ও পরিচালকবর্গকে উৎসাহিত করেন। সাধারণের দানের উপর বিদ্যালয়টির একান্ত নির্ভর ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বিশ্বনাথ মতিলাল, কালীনাথ রায়, উইলিয়ম অ্যাডাম ইহাকে রীতিমত অর্থ-সাহায্য করিতেন। রক্ষণশীল সমাজের নেতা মহারাজা কালীকৃষ্ণও

ক্রমে স্কুলটির পক্ষপাতী হন এবং অর্থ সাহায্য করেন। অ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্ট (প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭) হইতে জানা যাইতেছে, এই বিদ্যালয়টি আরপুলিতে অবস্থিত ছিল, এবং ১৮৩৫ সনে পাঁচ জন শিক্ষক প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৯টা পর্যন্ত দেড় শত ছাত্রকে পড়াইতেন। অর্থাভাব হেতুই যে কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন তাহাও জানিতে পারিতেছি। স্কুলটির আর্থিক অবস্থা ইহার পর আরও খারাপ হইয়া পড়ে। ১৮৩৫ ও ১৮৩৬ সনে অর্থাভাববশত ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত লওয়া সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী বৎসরে, ১৮৩৭ সনে, বার্ষিক পরীক্ষার বিবরণ দান প্রসঙ্গে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখিলেন যে, "প্রথমত হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বেতনদানে অক্ষম লোকেরদের ন্যূনাধিক দুই শত বালক ঐ খানে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বিদ্যালয়ের খরচ এপর্য্যন্ত প্রজার দানেতেই চলিয়াছে...।"[১৪]

'হিন্দু ফ্রি স্কুল' নামে আরও দুইটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। একটি হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রখ্যাতনামা ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক কর্তৃক শিমলায় ১৮৩১ সনেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রায় আশী জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। প্রত্যেক ছাত্রের নিকট হইতে পাঠ্যপুস্তকের অর্ধেক মূল্য মাত্র লওয়া হইত। এই নামে তৃতীয় স্কুল গোবিন্দচন্দ্র বসাক ১৮৩৪ সনে স্থাপন করেন। এখানকার ছাত্রদের ১৮৩৮ সনে গৃহীত একটি পরীক্ষার বিবরণ 'সমাচার দর্পণ' (৩১ মার্চ ১৮৩৮) এইরূপ দিয়াছেন, "গত শনিবার টৌনহালে হিন্দু ফ্রি স্কুলস্থ ছাত্রেরদের পরীক্ষা হইল। তাহার পরীক্ষক শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ছিলেন। এই বিদ্যালয় ১৮৩৪ সনে শ্রীযুত গোবিন্দ চন্দ্র বসাক স্থাপন

[১৪] এপ্রিল ৮, ১৮৩৭ সংখ্যক 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত। 'সমাচার দর্পণ' হইতে যেসব তথ্য উদ্ধৃত হইয়াছে তৎসমুদয়ই 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দ্বিতীয় খণ্ড হইতে গৃহীত

করেন এইক্ষণে তৎকার্য্য শ্রীযুত চন্দ্রমোহন বসাকের দ্বারা সম্পাদন হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক ১৩০ জন বালক ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষিত উভয় পক্ষে অতি প্রশংসনীয় হইয়াছে।"

হিন্দু লিবার্যাল একাডেমি নামে আর-একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩২ সনের ১ মার্চ তারিখে। হিন্দু কলেজের প্রগতি-পন্থী ছাত্রদের বিদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠাইতে যে-সব পিতামাতা অনিচ্ছুক ছিলেন তাহাদেরই জন্য এই বিদ্যালয়। 'সমাচার দর্পণে' (১৪ এপ্রিল, ১৮৩২) উদ্ধৃত 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদককে লিখিত একখানি পত্র হইতে জানা যায়, "১ মার্চ তারিখে শ্রীযুতবাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ও বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বেহারিলাল সেট এই কএক জনে হিন্দু লিবরল একাডিমি নামক এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক দীনদুঃখিদিগকে বিদ্যা দান করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা অনেক দুঃখি লোকের ইঙ্গরেজী পড়ার বড়ই সুগম হইয়াছে যেহেতু অন্য২ পাঠশালায় পড়িবার অনেক বাধা আছে কারণ কোন স্থানে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হয় ও কোন স্থানে বা অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু এই পাঠশালায় কোন শঙ্কা নাই ধর্ম্ম লোপ হয় না ও ব্যয়ো হয় না আর পূর্ব্বোক্ত বাবুরা কাগজ কলম ও বিবিধপ্রকার পুস্তক নিয়ম মতে অবাধে বিতরণ করিতেছেন এবং ছাত্রগণের নিকট হইতে ঐ সকল সামগ্রীর কিছুমাত্র মূল্য লন না।...কস্যচিৎ বড়বাজারস্থস্য।"

ভোলানাথ বসু ১৮৩৬ সনে জোড়াসাঁকোতে 'ওরিয়েণ্টাল ফ্রি স্কুল' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৭ সনে ইহার প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। ডেভিড হেয়ার ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। ছাত্রগণের সেক্সপীয়রের নাটকাদি হইতে আবৃত্তি সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

'হিন্দু চেরিটেবল ইন্‌স্টিটিউশন' নামে আর-একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। এ বিদ্যালয়টিও প্রাতঃকালে বসিত। ইহাতে আটটি শ্রেণী ছিল। ১৮৩৮ সনের ১৪ জুন টাউন হলে ছাত্রদের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হয়। মহারাজা কালীকৃষ্ণ ইহার সভাপতি হন। ডেভিড হেয়ার ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন (সমাচার দর্পণ, ২৩ জুন ১৮৩৮)।

গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ভবনে ডবলিউ. এস. পারকিন্স ১৮৩৬ সনে 'নেটিব-ইন্‌ফ্যাণ্ট স্কুল' নামে একটি অবৈতনিক শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিন হইতে ছয় বৎসর পর্যন্ত শিশুদিগকে ইংরেজি বাংলা নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এইটিই বোধ হয় আমাদের দেশে প্রথম শিশু-বিদ্যালয়। এক ব্যক্তি স্বয়ং স্কুলের ছাত্রদের পঠন-পদ্ধতি দেখিয়া আসিয়া 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশার্থ ২৪ নবেম্বর ১৮৩৬ তারিখে এক পত্র লেখেন। পত্রখানি পরবর্তী ১০ ডিসেম্বর তারিখে উক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। পত্র প্রেরক লেখেন— "...এক দিবস স্বয়ং গমন করিয়া দেখিলাম যে উক্ত বিদ্যামন্দিরে পঞ্চবিংশতি জন শিষ্য পাঠার্থে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উক্ত শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগের সহিত আমোদাহ্লাদে উপদেশ করিতেছেন। এবং নানাপ্রকার ছবি দেখাইতেছেন যাহা হউক কিয়ৎকাল শিশুগণেরা উপদেশ আদেশ ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অনেকোপকার দর্শিবে।..."

এখানে যে সকল অবৈতনিক পাঠশালার কথা উল্লিখিত হইল সে সকল ব্যতীত কলিকাতায় এইরূপ আরও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ; কিন্তু তৎসমুদয়ের উল্লেখের আর প্রয়োজন দেখি না। এই সকল অবৈতনিক বিদ্যালয় নানা কারণে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। সরকারী ঔদাসীন্য ইহার একটি প্রধান কারণ। পঞ্চম দশকে কলিকাতায় একটি মাত্র অবৈতনিক বিদ্যালয়ের উল্লেখ

সংবাদপত্রে পাইতেছি। এই বিদ্যালয়টির নাম 'ইণ্ডিয়ান ফ্রি স্কুল'। 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৫৯ সনে দুঃখ করিয়া লেখেন যে, এদেশীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে এই একটিই মাত্র তখন বিদ্যমান ছিল, অন্য সমুদয়ই উঠিয়া যায়। এই বিদ্যালয়টি ১৮৩৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৯ সনের ৫ অক্টোবর 'ক্যালকাটা কুরিয়র' নামক সংবাদপত্রে A. B. স্বাক্ষরে এক ব্যক্তি একটি নবপ্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া একখানি পত্র লেখেন। মনে হয় এই বিদ্যালয়টিই পরবর্তীকালের ইণ্ডিয়ান ফ্রি স্কুল। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ তারিখে সংবাদ প্রভাকর লেখেন, "ইণ্ডিয়ান ফ্রি স্কুল···এতদ্দেশীয় লোকেরা দুঃখি বালকদিগকে বিনা ব্যয়ে বিদ্যাধন বিতরণার্থ যত প্রাতঃকালীন বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কেবল এই একটি মাত্র বিদ্যালয় ইংরাজী ১৮৩৯ সালে সংস্থাপিত হইয়া এই উনবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত একাদিক্রমে এক প্রকার নিয়মে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে,···এই দাতব্য বিদ্যালয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহযোগি শিক্ষকগণের অনুরাগে কিছুমাত্র শৈথিল্য হয় নাই।"

পত্রোল্লিখিত কর্মাধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণের মধ্যে শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেহই নাই। উনিশ বৎসরের মধ্যে ইঁহাদের পরিবর্তন হইয়া থাকিবে। ১৮৫৭, ২৪ মার্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অষ্টাদশ বার্ষিক প্রকাশ্য পরীক্ষা হয়। রাণী রাসমণির দৌহিত্র যদুনাথ চৌধুরী প্রথম শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার দেন। 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ছাত্রদের বিংশতি বার্ষিক পরীক্ষাকালে (১৮৫৯) উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের পাঠে উৎকর্ষ সন্দর্শনে বিশেষ প্রীত হন। তিনি ১৮৫৯, ১০ মে দিবসীয় প্রভাকরে ইহার একটি বিবরণ প্রদান করেন, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধেও কিছু লেখেন। প্রভাকর-প্রদত্ত বিবরণটি এই—

"ইণ্ডিয়ান ফ্রি স্কুল নামক অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ২০ গণিত বার্ষিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক প্রদানের কার্য্য বিদ্যালয়ের গৃহেই নির্ব্বাহ হইয়াছে, ঐ পরীক্ষা সভায় আমরা উপস্থিত ছিলাম, কতিপয় বিশেষ বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিও সমাগত হইয়াছিলেন, ছাত্রেরা প্রশ্নাদির যথার্থ উত্তর প্রদান করাতে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ বিড়ম্বনা বশতঃ আয়াংশ অনেক ন্যূন হইয়াছে,...এইক্ষণে যে আয় হইয়া থাকে তাহাতে নিয়মিত ব্যয় সুনির্ব্বাহিত হয় না, একারণ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়েরা ব্যয় অনেক সংক্ষেপ করনে বাধ্য হইয়াছেন।

"বিংশতি বর্ষাতীত হইল, এই বিদ্যালয় শুধু এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের সাহায্য দ্বারাই সংস্থাপিত হয় পরে আকলেণ্ড বাহাদুর এবং অনেরেবল এইচ. টি. প্রিন্সেপ স্যার এডওয়ার্ড রায়ান স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট প্রভৃতি কতিপয় প্রধান পদস্থ অতি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ইহার অনুকূল করাতে এক সময়ে ইহার অবস্থা বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। প্রকাশ্য পরীক্ষা সময়ে টৌনহালে সিটন সাহেব এবং ডাক্তার গ্রাণ্ট প্রভৃতি সদ্বিদ্বান ব্যক্তিগণ সভাপতির আসনোপবিষ্ট হইয়া আপনারদিগের হস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন, অধুনা কেবল আনুকূল্য বিরহে সেই অবস্থার সম্যক পরিবর্ত্তন হওয়াতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, এই রাজধানী মধ্যে হিন্দুদিগের স্থাপিত অবৈতনিক বিদ্যালয় আর নাই, এবং এই ইণ্ডিয়ান ফ্রি স্কুল নামক বিদ্যালয় যথন বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত স্থাপিত রহিয়াছে, তথন বিদ্যানুরাগী মহাশয়দিগের পক্ষে ইহার প্রতি বিহিত মনোযোগ ও সাহায্য প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়।"
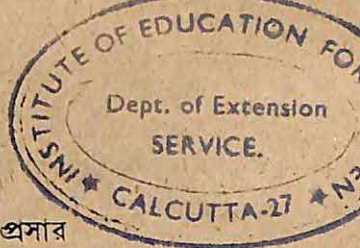
মফস্বলে জনশিক্ষার প্রসার

এই সময়ে মফস্বল অঞ্চলেও বিস্তর অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মফস্বলের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথমে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত টাকি স্কুলের কথা বলিতে হয়। টাকির বদান্য জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী ও বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী নিজ বাসভবনে ১৮৩২ সনের ১৪ জুন এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা এই কার্যে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। ডাফ প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার স্কুলের নিয়মাদি এখানে অনুসৃত হইত। এখানে ইংরেজি, বাংলা এবং ফার্সি এই তিনটি ভাষাই শিখাইবার ব্যবস্থা হয়। প্রতিষ্ঠার মাসখানেকের মধ্যেই প্রায় পাঁচ শত বালক এই বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে আসে। প্রতি বৎসর সমারোহের সহিত ছাত্রদের পরীক্ষা লওয়া হইত। সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখাইবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে 'সমাচার দর্পণ' (১ জুলাই ১৮৩৭) লেখেন—

"এই অত্যুত্তম পাঠশালার সংস্থাপক ও প্রতিপোষক শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় স্বদেশীয় মহাশয়সমাজের মধ্যে কি তিলক হইবেন না। ঐ পাঠশালা এইক্ষণে পাঁচ বৎসরাবধি চলিতেছে তাহাতে জেনরল আসেমলি সাহেবেরা যে খরচ দিতেছেন তদ্ভিন্ন ঐ বাবু বার্ষিক বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন। এবং টাকির ঐ বাবুদের আদর্শে অন্য এক জন ধনি জমিদার স্বীয় অঞ্চলে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছেন।"

তারকনাথ সেন সুখচরে 'বাউন্টিয়াস অ্যাকাডেমি' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৬ সনের ডিসেম্বর মাসে

গৃহীত ইহার ছাত্রদের পরীক্ষার কথা আমরা 'সমাচার দর্পণ' হইতে জানিতে পারিতেছি।

বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৭ সনের ৬ মার্চ বারাকপুরে ত্রিশটি মাত্র ছাত্র লইয়া একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মেদিনীপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক রসিকলাল সেনের উপর তিনি ইহার পরিচালনার ভার দেন। 'সমাচার দর্পণ' ১৮৩৭ সনের ১ এপ্রিল তারিখের 'জ্ঞানান্বেষণ' হইতে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠার বিষয় উদ্ধৃত করেন। অন্যান্য কথার মধ্যে 'জ্ঞানান্বেষণ' লেখেন—

"শ্রীযুতের বিদ্যালয়ে বালক গ্রহণে জাতিভেদ করা হইবেক না এবং কাগজ কলম পুস্তকাদি সমস্তই শ্রীযুত লার্ড সাহেব ছাত্রগণকে দিবেন আর যে সকল বালকেরা নীচের শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যোগ্য হইবেন তাহারা প্রতি মাসে বেতন স্বরূপ কিঞ্চিৎ২ পাইবেন ইহাতে এই উপকার হইবে যে বেতনের আশাতে বালকেরা বিশেষতঃ গরীব লোকের সন্তানেরা উৎসাহপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিবে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড সাহেব আরো কহিয়াছেন এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে মেডিকেল কালেজে অথবা হিন্দু কালেজে শিক্ষার্থ বলিয়া দিবেন।"

লর্ড অকল্যাণ্ডের নির্দেশ অনুসারে এই বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রদের হিন্দু কলেজে ও মেডিক্যাল কলেজে পাঠান হইত। অকল্যাণ্ড তাঁহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া মাসিক বৃত্তি দিতেন। তাঁহার নিকট হইতে মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পাইয়া এই স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ভোলানাথ বসু কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৪৫ সনে যে চারি জন বাঙালি যুবক চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিলাত গমন করেন ভোলানাথ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এক জন। তিনি ১৮৪৮ সনে প্রত্যাবৃত্ত লইয়া সরকারের অধীনে চিকিৎসা বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন।

বারাকপুর স্কুলটি পরবর্তী কালে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে

পরিণত হয়। ১৮৬৮-৬৯ সনের শিক্ষাবিষয়ক সরকারি রিপোর্টে (সংক্ষেপে, এডুকেশন রিপোর্টে) ইহার পূর্ব ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, ১৮৫৯ সন হইতে বারাকপুর স্কুলটি বৈতনিক হয়। এতদিন ইহার ব্যয় নির্বাহার্থ 'দরবার ফণ্ড' হইতে প্রতিমাসে আশী টাকা করিয়া দেওয়া হইতেছিল। ঐ সন হইতে এই অঙ্ক না বাড়াইয়া ইহা একটি পুরাপুরি জিলা স্কুলে পরিণত করা হয়।

বারাসতে ১৮৩৯ সনের জুলাইমাস নাগাদ একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ স্থানের কালীকৃষ্ণ মিত্র এবং নবীনকৃষ্ণ মিত্র এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকদের লইয়া ঐ বৎসর ১৩ জুলাই একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিয়া এই কার্যে বিশেষ সহায়তা করেন। বিদ্যালয়টি বহু বৎসর অবৈতনিক ছিল। পরে ১৮৫০ সনের জানুয়ারি মাসে স্থানীয় গবর্নমেণ্ট স্কুলের সঙ্গে ইহা মিশিয়া যায়। ১৮৪৯-৫০ সনের এডুকেশন রিপোর্টে এই ব্যাপার প্রসঙ্গে স্কুলটির পূর্ব ইতিহাসও প্রদত্ত হয়।

ইহা হইতে জানা যায়, বিদ্যালয়টি প্রথম প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট ট্রেভরের বিশেষ সহায়তা লাভ করে। পরে বারাসত গবর্নমেণ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে (১৮৪৬) একমাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের দানের উপর নির্ভর করিয়া দরিদ্র ভদ্রসন্তানদের পঠন-পাঠনের জন্য ইহা পরিচালিত হইতে থাকে। এই বিদ্যালয়টির কর্তৃপক্ষ পরে ইহাকে সরকারী স্কুলের সঙ্গে দুইটি সর্তে মিশাইবার প্রস্তাব করেন। ইহার একটি হইল— অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পাঠরত যাট জন বালককে নিজ নিজ শ্রেণীতে অর্ধ বেতনে সরকারী স্কুলে ভর্তি করিতে হইবে, দ্বিতীয়টি হইল— এই অতিরিক্ত ছাত্রদের জন্য তাহাদের পূর্বতন শিক্ষককেও এখানে নিযুক্ত করিতে হইবে।

সরকার দুইটি সর্তেই সম্মত হইলে, ১৮৫০ সনের জানুয়ারি মাসে

অবৈতনিক বিদ্যালয়টি উঠিয়া গেল। ইহার স্থলে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল ভদ্রমহোদয়কে লইয়া ইহার একটি পরিচালনা-কমিটি গঠিত হয়— কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, সুখময় মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র রায়, কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, নবীনকৃষ্ণ মিত্র এবং দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের অধিকাংশই অবৈতনিক বালক বিদ্যালয়েরও পরিচালক বা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

হুগলী হইতে এক ক্রোশ দূরে অমরপুর গ্রামে দানবীর তারকনাথ পালিতের পিতা কালীকিঙ্কর পালিত ১৮৩৭ সনের মাঝামাঝি বেনাভোলেণ্ট ইন্‌স্টিটিউশন নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় সম্পর্কে 'জে আর এম' স্বাক্ষরে একখানা পত্র ১৮৩৯ সনের ২৬ জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়—

"কালীকিঙ্করবাবুর সাহায্যে হুগলি হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অমরপুর গ্রামে নিঃস্ব ছাত্রেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থ যে বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন স্থাপন হইয়াছে তাহার কিয়ৎ বিবরণ প্রেরণ করি।… এই পাঠশালা দেড় বৎসরাবধি স্থাপিত হইয়াছে এবং এই অল্পকালের মধ্যে বালকেরা নানা প্রকার বিদ্যাতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়াছে। এবং অরিএণ্টাল সেমিনরি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রেরদিগকে নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষা দেওনার্থ উদ্যোগ করিতেছেন। …শেষোক্ত বিজ্ঞবর বাবুর অত্যন্ত মনোযোগ দ্বারা অত্যুত্তম পাঠশালার তুল্য এই পাঠশালা হইবে এবং শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত এই মহা ব্যাপারের বিষয়ে যে বিলক্ষণ মনোযোগ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্ত প্রশংসা পাত্র হইয়াছেন।"

১৮৪৩-৪৪ সনের এডুকেশন রিপোর্টে এই বিদ্যালয়টির যে বিবরণ দেওয়া হয় তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে অমরপুর অবৈতনিক

স্কুল কালীকিঙ্কর পালিতের দানেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল, সরকার পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য সামান্যমাত্র অর্থ দিতেন। ১৮৪৩ সনের ডিসেম্বরে মৃত্যুকাল অবধি কালীকিঙ্কর এইরূপ অর্থ দিয়া আসিতেছিলেন। মৃত্যুর পরে দেখা গেল স্কুলটির পরিচালনার জন্য তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিছুকাল নিজ দায়িত্বে বিনা বেতনে ইহা চালাইয়াছিলেন, পরে দ্বিতীয় শিক্ষক এ কার্যে ব্রতী হন। শেষে প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া যান, দ্বিতীয় শিক্ষক বোয়ালিয়া গবর্নমেণ্ট স্কুলে কর্ম গ্রহণ করেন।

অমরপুর বিদ্যালয়টি ১৮৪৪ সনের ২৫ এপ্রিল উঠিয়া যায়।

চন্দননগরে ১৮৩৫ সনে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সমাচার দর্পণ' (৬ জুন ১৮৩৫) এ সম্বন্ধে লেখেন—

"ইতিমধ্যে ফ্রান্সীয় বা ইঙ্গলণ্ডীয় এমত কোন শিক্ষক প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওনের কল্প হইয়াছে। ফুডচেরির গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালার ব্যয়ার্থ কতক টাকা সংস্থান করিয়া দিয়াছেন তদতিরিক্ত সাধারণ ব্যক্তিরদের চাঁদার টাকাতে তাহার ব্যয় চলিতেছে ছাত্রেরদের স্থানে বেতন লওয়া যায় না। পাঠশালায় নিয়ম এই যে সর্ব্বজাতীয় বালকেরদিগকে জাতি ও ধর্ম্ম বিবেচনা ব্যতিরেকেই প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি আছে এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের কোন মান বিচারের হানি বা কোন উদ্বেগ না হয় এনিমিত্ত ঐ পাঠশালাতে ধর্ম্মবিষয়ক কোন উপদেশ দেওয়া যাইবে না। এই বিষয়ে হিন্দুকালেজের যেমন নিয়ম আছে তদনুসারে কার্য্য চলিবে।"

নদীয়া শান্তিপুরের জমিদার মতিলাল রায় সেখানে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উনিশ জন বিশিষ্ট শান্তিপুরবাসী 'সমাচার দর্পণে' ইহার উল্লেখ করিয়া একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানি ১৮৩৬ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। ইহার কিয়দংশ এই—

"জিলা নবদ্বীপের মধ্যে শান্তিপুর গ্রাম প্রধান সমাজ এবং অধিক অন্যান্য জাতীয় ব্যতীত কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণ জাতির ৫০০০ হাজার ঘর বসতি ইহার মধ্যে বিনা বেতনে বিদ্যাভ্যাস হওন বিদ্যালয় না থাকাতে অধিকাংশ বালক মুর্খ হয় বোধে গ্রামস্থ জমিদার এবং বিশিষ্ট শিষ্ট পরোপকারি শ্রীল-শ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় মহাশয় স্বয়ং খরচে ঐ গ্রামের মধ্যস্থলে উত্তম ইষ্টকনির্ম্মিত দোতালা বাটী ভাড়া লইয়া এক জন হিন্দু কলেজের ফাষ্ট ক্লাসের উত্তীর্ণ বিদ্বান ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসকারককে নিযুক্ত করিয়াছেন অত্যল্পকাল অর্থাৎ ৫ মাস আন্দাজ হইবেক। ইহাতেই ১০০ শত বালকের অতিরিক্ত হইয়াছে ঐ কালেজের পাঠের দাঁড়াসকল দৃষ্ট করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম।"

প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় স্বয়ং সমাচার দর্পণে স্কুলটি সম্বন্ধে একখানা পত্র লেখেন। দর্পণ ১৮৩৭, ১৯ জুন ইহা প্রকাশিত করেন। পত্র-খানিতে মতিলাল বালকদের একটি পরীক্ষার কথা লেখেন। অল্পকালের মধ্যেই তাহারা পাঠে কিরূপ উন্নতি করিয়াছিল ইহা হইতে তাহা জানা যায়। তিনি লেখেন—

"যে চেরেটী স্কুল শান্তিপুরে আমি স্থাপন করিয়াছি তাহাতে ৮৬ জন বালক হইয়াছে গত ২৪ চৈত্র বৃহস্পতিবার জিলা নবদ্বীপস্থ ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত মেং ডবলিউ আই ডিয়ের সাহেব স্কুল ইষ্টার্থে আগমন করিয়া বালকদিগের পাঠের পরীক্ষা লইলেন তদ্দারা ফাষ্ট ক্লাসের বালক শ্রীভগবান হালদার ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামরত্ন চট্টোপাধ্যায় ওগয়রহ উত্তমপ্রকার ইস্পীচ এবং ভূগোলীয় যাবদীয় বৃত্তান্ত পরীক্ষা দেওয়া যায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম ক্লাসের বালক সকল ইস্পীচ ও গ্রামার ও গয়রহ ও ইস্পেলিং প্রভৃতি নানাপ্রকার পরীক্ষা দেওয়া যায়। উক্ত সাহেব তদ্দৃষ্টে অতি সন্তুষ্ট হইয়া বালকদিগকে এবং স্কুল হেড মাষ্টার মেং এণ্ড্রূ সেবিন্স সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া স্কুলের

বালকেরদিগের প্রকাশ্য একজামিনকরণ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন এবং তৎ-কালীন যে যেমন উপযুক্ত তাহাকে তদ্রূপ প্রাইজ দেওয়া স্থির করিলেন।”

এই সকল বিদ্যালয় ব্যতীত ত্রিবেণী ও অন্যত্রও বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে। নব-প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশ অবৈতনিক ছিল।

অ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্ট ও তাহার পরিণাম

উইলিয়ম অ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্টের কথা ইতিপূর্বে একাধিক-বার উল্লিখিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে এখানে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি ১৮১৭ সনে ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রী হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ক্রমে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। এডাম পাদ্রীদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া সংবাদ'পত্র সেবাকেই জীবিকার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিলেন। সে-যুগের বিখ্যাত সংবাদপত্র ইণ্ডিয়া গেজেট সম্পাদনায় তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। বেঙ্গল হরকরা ও ইণ্ডিয়া গেজেট একত্রিত হইলে ইহার নূতন স্বত্বাধিকারী দ্বারকানাথ ঠাকুর পুনরায় অ্যাডামকেই ইহার সম্পাদনা কার্যে নিয়োগ করেন। ভারত-বাসীদের শিক্ষার যাহাতে উন্নতি হয় সেবিষয়ে অ্যাডাম বিশেষ চিন্তা করিতেন। তিনি ১৮২৯ কি ১৮৩০ সনে বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নিকট শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে নিজ মতামত সম্বলিত একখানি স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বেন্টিঙ্ক উক্ত স্মারকলিপি অনুযায়ী তখনই কোনো ব্যবস্থা না করিলেও অ্যাডাম হাল ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি সুবিধা পাইলেই এদেশবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে বেন্টিঙ্কের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় রত হইতেন। অ্যাডাম অনুরুদ্ধ হইয়া বেন্টিঙ্ককে ১৮৩৫ সনের ২ জানুয়ারি একখানি পত্রে

তাঁহার প্রস্তাব লিখিয়া জানান। সপরিষদ বড়লাট ১৮৩৫, ২০ জানুয়ারি অ্যাডামের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহার পর অ্যাডাম তৎকালীন বে-সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া গবর্নমেণ্টকে রিপোর্ট দিবার জন্য কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া হইল যে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন বা শিক্ষা-সমাজের নির্দেশে তাঁহাকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

ইহার অল্পকাল পরে বেন্টিঙ্কের ভারত-ত্যাগের প্রাক্কালে শিক্ষা-বিষয়ক কতকগুলি রীতি-পদ্ধতি অতি দ্রুত ঠিক হইয়া যায়। শিক্ষা-সমাজ পূর্ব হইতেই দুই দলে বিভক্ত হইয়া শিক্ষার বাহন সংস্কৃত ও ফার্সি থাকিবে, না ইংরেজি হইবে ইহা লইয়া নানারূপ বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। বড়লাটের শাসন-পরিষদের প্রথম ব্যবহার-সচিব টমাস বেবিংটন মেকলে শিক্ষা-বিভাগীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি ইংরেজিকেই শিক্ষার বাহন করিতে বড়লাটকে পরামর্শ দিয়া চিরতরে বাগ্‌বিতণ্ডার নিরসন করিতে পরামর্শ দিলেন। বড়লাট বেন্টিঙ্ক মেকলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পরবর্তী ৭ মার্চ সপরিষদ এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সরকারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার বাহন হইবে ইংরেজি, এবং অতঃপর শিক্ষা-খাতে নির্দিষ্ট অর্থ ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইবে। প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অনুসন্ধানের পর যাহাতে সরকারী শিক্ষানীতি নির্ধারিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই অ্যাডামকে কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু অ্যাডামের রিপোর্টের অপেক্ষা না করিয়াই সরকার উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করার অবকাশ নাই। তবে অ্যাডামের কার্যের উপরে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না। তিনি অতি তৎপরতার সহিত অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।

অ্যাডাম ১৮৩৫ সনের ১ জুলাই, ২৩ ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮ সনের ২৮ এপ্রিল তিন খণ্ডে যথাক্রমে তাঁহার অনুসন্ধানের ফলাফল সরকারে পেশ করিলেন। ইহাই মোটামুটি অ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্ট নামে আখ্যাত হয়। রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে পূর্ব-প্রকাশিত শিক্ষা ও রাজস্ব সংক্রান্ত রিপোর্ট ও পুস্তক-পুস্তিকার উপর নির্ভর করিয়া এদেশের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান যাবতীয় প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি আনুপূর্বিক বিবরণ প্রদান করেন। দ্বিতীয় খণ্ডে রাজসাহীর নাটোর মহকুমার শিক্ষাপদ্ধতির খুঁটিনাটি তথ্য প্রদত্ত হয়। তৃতীয় খণ্ডে, বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গমনান্তর সেই সেই স্থানের শিক্ষাপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে অ্যাডাম যেসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহা লিপিবদ্ধ হইল। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতি সাধনের একটি পরিকল্পনাও ইহাতে তিনি সন্নিবিষ্ট করিলেন। কমিশনার অ্যাডাম ইহাতে প্রচলিত জনশিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়াই আমাদের জাতীয় শিক্ষাসৌধ গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব করিলেন। এইজন্য ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাডাম দেখিলেন, বহুনিন্দিত এবং চির-অবজ্ঞাত পাঠশালাই বাঙালির শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নানা বিপদ-আপদের মধ্যে জীয়াইয়া রাখিয়াছে। অ্যাডাম ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। তিনি সেখানকার প্রাথমিক শিক্ষাগার-গুলির সঙ্গে ইহাদের তুলনা করিয়া বলেন, বঙ্গদেশের পাঠশালাসমূহের শিক্ষা যেরূপ জীবনানুগ, অর্থাৎ জনগণের জীবনযাপনপ্রণালী অনুসারী, তাঁহার স্বদেশীয় পাঠশালাগুলি সেরূপ নহে। ইহাকে যদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংস্কৃত করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষা-বিস্তারে ইহাই আশু ফলপ্রদ হইবে। কলিকাতার স্কুল সোসাইটির দেশীয় পাঠশালাসমূহের আর্থিক উন্নতি-প্রচেষ্টার বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন। অ্যাডামের পরিকল্পনার চুম্বক এখানে প্রদত্ত হইল।

অ্যাডাম বলেন, গ্রামকে আমাদের 'ইউনিট' বা মূল একক বলিয়া

তাঁহার প্রস্তাব লিখিয়া জানান। সপরিষদ বড়লাট ১৮৩৫, ২০ জানুয়ারি অ্যাডামের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহার পর অ্যাডাম তৎকালীন বে-সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া গবর্নমেণ্টকে রিপোর্ট দিবার জন্য কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া হইল যে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা শিক্ষা-সমাজের নির্দেশে তাঁহাকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

ইহার অল্পকাল পরে বেণ্টিঙ্কের ভারত-ত্যাগের প্রাক্কালে শিক্ষা-বিষয়ক কতকগুলি রীতি-পদ্ধতি অতি দ্রুত ঠিক হইয়া যায়। শিক্ষা-সমাজ পূর্ব হইতেই দুই দলে বিভক্ত হইয়া শিক্ষার বাহন সংস্কৃত ও ফার্সি থাকিবে, না ইংরেজি হইবে ইহা লইয়া নানারূপ বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। বড়লাটের শাসন-পরিষদের প্রথম ব্যবহার-সচিব টমাস বেবিংটন মেকলে শিক্ষা-বিভাগীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি ইংরেজিকেই শিক্ষার বাহন করিতে বড়লাটকে পরামর্শ দিয়া চিরতরে বাগ্‌বিতণ্ডার নিরসন করিতে পরামর্শ দিলেন। বড়লাট বেণ্টিঙ্ক মেকলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পরবর্তী ৭ মার্চ সপরিষদ এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সরকারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার বাহন হইবে ইংরেজি, এবং অতঃপর শিক্ষা-খাতে নির্দিষ্ট অর্থ ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইবে। প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অনুসন্ধানের পর যাহাতে সরকারী শিক্ষানীতি নির্ধারিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই অ্যাডামকে কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু অ্যাডামের রিপোর্টের অপেক্ষা না করিয়াই সরকার উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করার অবকাশ নাই। তবে অ্যাডামের কার্যের উপরে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না। তিনি অতি তৎপরতার সহিত অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।

অ্যাডাম ১৮৩৫ সনের ১ জুলাই, ২৩ ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮ সনের ২৮ এপ্রিল তিন খণ্ডে যথাক্রমে তাঁহার অনুসন্ধানের ফলাফল সরকারে পেশ করিলেন। ইহাই মোটামুটি অ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্ট নামে আখ্যাত হয়। রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে পূর্ব-প্রকাশিত শিক্ষা ও রাজস্ব সংক্রান্ত রিপোর্ট ও পুস্তক-পুস্তিকার উপর নির্ভর করিয়া এদেশের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান যাবতীয় প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি আনুপূর্বিক বিবরণ প্রদান করেন। দ্বিতীয় খণ্ডে রাজসাহীর নাটোর মহকুমার শিক্ষাপদ্ধতির খুঁটিনাটি তথ্য প্রদত্ত হয়। তৃতীয় খণ্ডে, বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গমনান্তর সেই সেই স্থানের শিক্ষাপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে অ্যাডাম যেসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহা লিপিবদ্ধ হইল। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতি সাধনের একটি পরিকল্পনাও ইহাতে তিনি সন্নিবিষ্ট করিলেন। কমিশনার অ্যাডাম ইহাতে প্রচলিত জনশিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়াই আমাদের জাতীয় শিক্ষাসৌধ গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব করিলেন। এইজন্য ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাডাম দেখিলেন, বহুনিন্দিত এবং চির-অবজ্ঞাত পাঠশালাই বাঙালির শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নানা বিপদ-আপদের মধ্যে জীয়াইয়া রাখিয়াছে। অ্যাডাম ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। তিনি সেখানকার প্রাথমিক শিক্ষাগার-গুলির সঙ্গে ইহাদের তুলনা করিয়া বলেন, বঙ্গদেশের পাঠশালাসমূহের শিক্ষা যেরূপ জীবনানুগ, অর্থাৎ জনগণের জীবনযাপনপ্রণালী অনুসারী, তাঁহার স্বদেশীয় পাঠশালাগুলি সেরূপ নহে। ইহাকে যদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংস্কৃত করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষা-বিস্তারে ইহাই আশু ফলপ্রদ হইবে। কলিকাতার স্কুল সোসাইটির দেশীয় পাঠশালাসমূহের আর্থিক উন্নতি-প্রচেষ্টার বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন। অ্যাডামের পরিকল্পনার চুম্বক এখানে প্রদত্ত হইল।

অ্যাডাম বলেন, গ্রামকে আমাদের 'ইউনিট' বা মূল একক বলিয়া

ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ ইহাই স্বাভাবিক। যেমন গ্রাম হইতে থানা, থানা হইতে মহকুমা, মহকুমা হইতে জেলা, জেলা হইতে বিভাগ, বিভাগ হইতে প্রদেশ, সেই রকম শিক্ষাও উচ্চ হইতে উচ্চতর হইবে। গ্রামের পাঠশালাই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি। যে ধরনের শিক্ষাপরিকল্পনাই করা হউক এই পাঠশালাকে ভিত্তি করিয়া রচিত, না হইলে তাহা কখনই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে না। অ্যাডামের উক্তির যাথার্থ্য শতাব্দীকাল পরে আজ আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি। বর্তমানে যে আদ্য-শিক্ষার (Basic Education) আয়োজন হইতেছে তাহাও এই গ্রাম এবং গ্রামের পাঠশালাকে ভিত্তি করিয়াই করার চেষ্টা হইতেছে। অ্যাডাম পাঠশালার উন্নতির দিকেই তাঁহার চিন্তা নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। প্রথমত পাঠশালার শিক্ষা হইবে ছাত্রদের নিজ নিজ মাতৃভাষায়। পাঠশালা চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে, পাঠ্যপুস্তকও হইবে চারি রকমের। প্রত্যেক শ্রেণীর কি কি পাঠ্য সে সম্বন্ধেও অ্যাডাম দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়াছেন। আমরা ইহাতে দেখিতে পাই, পল্লীজীবনের উপযোগী সাধারণ ও ব্যবহারিক জ্ঞানের কোনো বিষয়ই ইহা হইতে বাদ পড়ে নাই। বর্ণ পরিচয়, শুভঙ্কর ও উগ্র বলরামের গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, বাংলা শুদ্ধলিখন, পত্রদলিল, দেশীয় আইন, স্থানীয় শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান, এ সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়সমূহ চারি শ্রেণীতে পাঠ্য বলিয়া ধরিয়া লন। এই সকল বিষয়ের সত্বর পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা করিতেও বলা হইল। এখানে আর-একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। অ্যাডাম ধর্মশিক্ষাকে পাঠশালার পাঠ্যতালিকা হইতে বাদ দেন নাই। তবে কোনো বিশেষ ধর্মের আচার-আচরণ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের পরিবর্তে ধর্মের মূল সত্য—যাহার সঙ্গে সকল ধর্মেরই মিল রহিয়াছে, তাহাকেই ধর্মশিক্ষার অঙ্গীভূত করিবার প্রস্তাব করেন।

ইহার পর পাঠশালার ক্রমোন্নতির বিষয় অ্যাডাম চিন্তা করেন। পাঠশালার শিক্ষককে পাঠ্য বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া এবং ছাত্রদের পাঠে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ম Examiner বা পরীক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করা হইল। শিক্ষকদের পাঠ্য পুস্তক পঠন-রীতি আয়ত্ত করাইবার জন্ম ক্রমে নর্মাল স্কুল স্থাপনের কথাও তিনি বলেন। পরীক্ষকদের উপরে থাকিবেন Inspector বা পরিদর্শক। প্রত্যেকের শ্রেণীভেদে আনুমানিক বেতন ও ভাতার বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। শিক্ষকগণকে নিজ নিজ ছাত্রদের পাঠে উৎকর্ষ অনুযায়ী পুরস্কার দানের প্রস্তাবও তিনি করেন। এই ব্যাপারটি সাময়িক হইলেও শিক্ষকগণ এইরূপ পুরস্কারলাভে বিশেষ উৎসাহিত হইবেন; পরীক্ষকগণ পরীক্ষান্তে যোগ্য শিক্ষকদের পুরস্কৃত করিবেন।

শিক্ষকগণ যাহাতে নির্ঝঞ্ঝাটে শিক্ষাদান-কার্যে ব্রতী থাকিতে পারেন সেজন্ম তাঁহাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা সর্বাগ্রে করিয়া দিতে হইবে। শাসনকর্তৃপক্ষ এবং জমিদার সম্প্রদায় এবিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। গবর্নমেণ্ট হইতে সাহায্য, জমিদারের দান, শিক্ষার জন্ম আলাদা কর স্থাপন প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করিয়া চতুর্থ দফায় যে উপায়ের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হিন্দুসমাজের রীতি-সম্মত। অ্যাডাম প্রস্তাব করিলেন, আর্থিক দুশ্চিন্তা বিদূরণের জন্ম কয়েক বিঘা জমি প্রত্যেক শিক্ষকের জন্ম আলাদা করিয়া রাখা হোক, ইহার উপস্বত্ব তিনি ভোগ করিবেন। অ্যাডাম নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন যে, ইহা হিন্দুর সামাজিক রীতি-সম্মত এবং জমিদার ও গবর্নমেণ্টের সহযোগিতায় এরূপ ব্যবস্থা কার্যকর হওয়া আদৌ কঠিন নহে। ইহার পরে এই প্রসঙ্গেই অ্যাডাম বলিলেন যে, জনশিক্ষার জন্ম তো গবর্নমেণ্টই দায়ী। অন্ম কোনোরূপে অর্থ সংগৃহীত না হইলে তাঁহাদিগকেই ইহা যোগাইবার উপায় করিয়া দিতে হইবে। তিনি লিখিলেন :

"If all other resources fail, there is still one left, the general revenue of the country on which the poor and the ignorant have a primary claim—a claim which is second to no one other whatsoever, for *from whence is that revenue derived, but from the bones and the sinews, the toil and sweat of those whose cause I am pleading?* Shall £10,000 continue to be the sole permanent appropriation from a revenue of more than twenty millions sterling for the education of nearly a hundred millions of people?"[১৫]

অর্থাৎ, কোনো উপায়েই যদি অর্থের সংস্থান না হয় তবে গবর্নমেণ্টের রাজস্ব হইতেই ইহা জোগাইতে হইবে। কারণ ইহার উপরে লক্ষ লক্ষ নিঃসম্বল অজ্ঞ লোকের দাবি সবচেয়ে বেশি। ইহারাই তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া তাঁহাদের রাজস্ব উৎপাদনের পন্থা করিয়া দেয়। দশ কোটি লোকের শিক্ষার নিমিত্ত বাৎসরিক রাজস্ব কুড়ি কোটি টাকা হইতে মাত্র এক লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ আর কতকাল চলিবে?

অ্যাডাম প্রথমে দুইটি কি তিনটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে সত্বর কার্য আরম্ভ করিবার জন্য গবর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানাইলেন। তিনি প্রথমে মাত্র একটি জেলায় কার্য আরম্ভ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তাঁহার আশঙ্কা ছিল, যদি কোনো কারণে সেখানে তাঁহার পরিকল্পনা ফলপ্রদ না হয় তাহা হইলে তাঁহার পরিকল্পনাই অবাস্তব, এরূপ বিবেচিত হইতে পারে। এই আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক ছিল না তাহা বুঝাও বিশেষ কঠিন নয়। এ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক।

[১৫] *Reports on the State of Education in Bengal, etc.*, pp. 400-1, Calcutta University.

আমরা জানি, অ্যাডাম দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা অনুসন্ধানের জন্য কমিশনার নিযুক্ত হইবার মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে ইংরেজি ভাষাকেই ভারত গবর্নমেণ্ট শিক্ষার বাহন বলিয়া ধার্য করেন। তখনকার দিকে মেকলে প্রমুখ শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ এইরূপ ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন যে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ভদ্র ব্যক্তিদের ছেলেরা শিক্ষালাভ করিলে ক্রমে অজ্ঞ দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যেও উহা ছড়াইয়া পড়িবে। ইহার নাম দেওয়া হয় 'filtration theory', অর্থাৎ, ফিল্টারে যেমন জল উপরের কলসী হইতে চুয়াইয়া ক্রমান্বয়ে নীচের কলসীগুলিতে গিয়া পড়ে, উক্তরূপ শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারাও তেমনি ক্রমিকভাবে সমাজের নিম্নস্তরে শিক্ষা ছড়াইয়া পড়িবে। কর্তৃপক্ষের এরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইবার মূলে অর্থনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল। ভদ্র সঙ্গতিপন্ন লোকের ছেলেদের শিক্ষার জন্য সরকারের কোষাগার হইতে স্বল্প ব্যয় করিলেই চলিবে, দরিদ্র জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হইলে যে ইহার প্রায় সমগ্রটাই ব্যয় করিতে হয়! স্বল্প ব্যয়ে ভদ্র সন্তানদের শিক্ষিত করিয়া তুলিলে সুলভে সরকারী কর্মচারী জুটিবে। ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করার মূলে নিজ স্বার্থসিদ্ধির চিন্তাও যে ছিল না, তাহা বলা যায় না।

অ্যাডামের প্রস্তাব ছিল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি দেশীয় প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেই ভাবী উন্নতির সূত্র ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পাঠশালার উন্নতিতেই জনগণের উন্নতি, জাতির উন্নতি। অশিক্ষা এবং শোষণের ফলে যে জাতির ক্রমশ অধোগতি হইতেছে তাহা রোধ করিবার মুখ্য উপায় প্রচলিত জনশিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতিসাধন। আর তাঁহার সমর্থনে তিনি লর্ড ময়রা, টমাস মনরো, চার্লস মেটকাফ প্রভৃতির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ভারতের ইংরেজশাসন তখনই জনসাধারণের প্রীতিপদ হইবে যখন সত্য সত্যই এইরূপ জনশিক্ষা-ব্যবস্থা সুপ্রচলিত হইবে। ইহার অন্যথায় বিষম অবস্থার সৃষ্টি হওয়া

আশ্চর্য নয়। অ্যাডাম বলেন, ইংরেজি শিক্ষার ফলে ইতিমধ্যেই এদেশ-বাসীদের মধ্যে এমন এক দল লোকের উদ্ভব হইয়াছে যাহারা নিজ সমাজের মঙ্গলের প্রতি উদাসীন এবং ইংরেজ-শাসনের প্রতিও আস্থাবান্ নহে।

জনশিক্ষার প্রতি শিক্ষা-সমাজের মনোভাব এই সময় কিরূপ ছিল তাহার আভাস আমরা ইতিপূর্বে পাইয়াছি। ইংরেজিকে যখন শিক্ষার বাহন করা স্থির হইল সেই সময় বাংলাভাষার কথা কাহারও মনে আসে নাই। দেশীয় পাঠশালাসমূহের উন্নতি যে আবশ্যক এ চিন্তাও কর্তৃপক্ষের মনে স্থান পাইল না। অ্যাডাম যখন শিক্ষা-সমাজে রিপোর্ট পেশ করেন তখন তাঁহারা ইহা গ্রহনে তাঁহার অপরিসীম অধ্যবসায় এবং বিপুল শ্রমশক্তির প্রশংসা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা যে গ্রহণীয় নয় সেকথা প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিলেন না। তাঁহাদের মতে—

"After a careful consideration of these propositions for the improvement of the rural schools, we fear that the execution of the plan would be almost impracticable ; in consequence of the complicated nature of the details, which would also involve much more expense and difficulty than Mr. Adam has supposed.

"A further experience and a more mature consideration of the important subject of education in this country has led us to adhere to the opinion formerly expressed by us, that our efforts should be at first concentrated to the chief towns or *sudder* stations of districts and to the improvement of education among the higher and the middling classes of the population ; in the expectation that through the agency of these scholars an educational reform will descend to the rural vernacular schools, and its benefits be rapidly

transfused among all those excluded in the first instance by abject want from a participation of the advantages."[১৬]

পূর্বোক্ত 'filtration theory' যে শিক্ষাবিভাগকে পাইয়া বসিয়াছিল ইহা হইতে তাহা পরিষ্কার প্রতীতি হয়। কর্তৃপক্ষ এখানে বলেন—

"দেশীয় পাঠশালাসমূহের উন্নতিকল্পে যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা কার্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। কারণ এই পরিকল্পনায় বিস্তর খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাকে কার্যকর করার পক্ষে যে কতদূর অসুবিধা ও ব্যয়বাহুল্য হইবে তাহা অ্যাডামও ভাবিতে পারেন নাই।

"অধিকতর অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, পূর্বে আমরা যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছি, প্রত্যেক জেলার প্রধান শহরে আমরা এখন আমাদের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রাখিব যাহার দরুন উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেরাই উন্নততর শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। এই ধরণের শিক্ষা পাইয়া তাহারা এদেশীয় পাঠশালাসমূহের উন্নতি করিতে অবহিত হইবে। দারিদ্র্য নিবন্ধন যাহারা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় উপকৃত হইবে না তাহারা এইরূপে দ্রুত শিক্ষাপ্রসারের ফলে উহাদের সাহায্যে শিক্ষিত হইতে পারিবে।"

তৎকালীন বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁহার ২৪ নবেম্বর ১৮৩৯ তারিখের শিক্ষাবিষয়ক বিখ্যাত 'মিনিটে'ও অ্যাডামের প্রস্তাব গ্রহণের বিরুদ্ধে মত দিলেন। তিনি বলিলেন, দেশভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচিত না হইলে এরূপ পাঠশালার সংস্কার ও উন্নতি সাধন সম্ভবপর নহে। পাঠ্যপুস্তক রচনা সম্পর্কে শিক্ষা-সমাজ একটি সাব-কমিটি গঠন করেন।

---

১৬ *Selections from Educational Records,* Part II, by J. A. Richie p 65.

এ-বিষয়ে পরে বলা হইবে। অ্যাডামের তথ্যপূর্ণ 'রিপোর্ট' ও পরিকল্পনা এইরূপে সরকারের নথিভুক্তই রহিয়া গেল।

হিন্দু কলেজ পাঠশালা বা বাংলা পাঠশালা

বাংলাভাষা-শিক্ষা তথা দেশীয় পাঠশালা সম্পর্কে শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব ১৮৩৮-৩৯ সন নাগাদ কি প্রকার বিরূপ হইয়া পড়িয়াছিল আমরা তাহার আভাস পাইলাম। ইংরেজি শিক্ষা তখন আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদার সোপান হইয়া দাঁড়ায়। এইসব আপাত লাভে জনগণকে বিভ্রান্ত হইতে দেখিয়া সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইহার প্রতিকারকল্পে একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হইলেন। এ সম্বন্ধে এখানে একটু বিস্তৃতভাবে বলা প্রয়োজন।

হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা দেশের চিন্তাশীল গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত। রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ কলেজের অধ্যক্ষগণ বাংলাভাষার মাধ্যমে ছেলেদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজের অধীনে একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইলেন। জনহিতৈষী ডেভিড হেয়ার ও অন্যান্য ইংরেজ বান্ধবগণও তখন তাঁহাদের সহায়তা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। হিন্দু কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে, অধুনা যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ রহিয়াছে সেই জমি, ইহারই সম্পত্তি ছিল। এই স্থানে একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর ১৮৩৯ সনের ১৪ জানুয়ারি ডেভিড হেয়ার কর্তৃক প্রোথিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ-সভা পাঠশালার জন্য অর্থ-সংগ্রহ, ছাত্র-নির্বাচন, শিক্ষক-নিয়োগ, পাঠ্য-তালিকা স্থিরীকরণ ও পুস্তক-রচনা প্রভৃতি কার্য নির্বাহার্থে ডেভিড হেয়ার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতিকে লইয়া একটি

সাব-কমিটি গঠন করেন। যাহাতে পাঠশালার কার্য সত্বর আরম্ভ করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে এই কমিটি সচেষ্ট হইলেন।

কমিটি স্থির করিলেন, পাঠশালায় বাংলাভাষার মাধ্যমে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে। ১৮৪৩-৪৪ সনের শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে (পৃ ১৯) পাঠশালার মূল উদ্দেশ্যের এইরূপ উল্লেখ আমরা পাইতেছি :

"The primary object contemplated in the establishment of the patshala were to provide a system of national education, and to instruct Hindoo youths in literature, and in the sciences of India and of Europe, through the medium of the Bengali Language."

কমিটি বাৎসরিক বেতনের হার উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী ভেদে চারি টাকা ও দুই টাকা ধার্য করিলেন। আরও ঠিক করিলেন যে, দ্বাদশবর্ষের উর্দ্ধ বয়স্ক কাহাকেও পাঠশালায় ভর্তি করা হইবে না। পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ সম্পর্কে দেখিতেছি তাঁহারা অ্যাডামকেই কতকটা অনুসরণ করিয়াছেন। কমিটি অ্যাডামের চারি শ্রেণীর বদলে মূল তিন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নির্ণয় করেন, যথা— প্রথম শ্রেণীতে অক্ষর, বানান, হিতোপদেশক ইতিহাস, ব্যাকরণ ও গণিতের প্রাথমিক সূত্র, গোলাধ্যায়ের মূল প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে ব্যাকরণ, অঙ্ক, ক্ষেত্র-পরিমাপক বিদ্যা, গোলাধ্যায়, জ্যোতির্বিদ্যা, শুদ্ধরূপে ভাষাকথনের বিধি, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং পত্রলিখন-রীতি ; তৃতীয় শ্রেণীতে শুদ্ধরূপে ভাষাকথনের নিয়ম, জমিদারী ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যবহার, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, বীজগণিত, রাজনীতি, নীতিবিদ্যা, ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা, গবর্নমেণ্টের আইন ও আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যবস্থা।[১৭]

১৭ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০

ছেলেদের বারোটি ক্লাসে ভর্তি করার ব্যবস্থা হয়। এখানে তাহারা উক্ত তিন শ্রেণীর পুস্তক সম্পূর্ণ পাঠ করিবে। তাহারা পাঠ্যপুস্তক বিনা মূল্যে পাইবে। কিন্তু তাহাদিগকে বেতন-বাবদ কিছু দিতে হইবে। পাঠশালার নিয়মকানুন-রচনা, শিক্ষক-নির্বাচন এবং পাঠ্যপুস্তকের তালিকা নির্ধারণে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের চেষ্টাযত্ন বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। পাঠ্যপুস্তক রচনার ভারও উপযুক্ত লোকের উপর দিবার প্রস্তাব হইল। এক কথায়, কলেজের অধ্যক্ষ-সভা বাংলা পাঠশালাকে একটি আদর্শ বাংলা বিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

পাঠশালার শিলান্যাসের পর গৃহনির্মাণ-কার্য পরবর্তী জানুয়ারি মাসের আরম্ভেই শেষ হইল। ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ কলিকাতার বহু নেতৃস্থানীয় ইংরেজ ও বাঙালি প্রধানের সম্মুখে বাংলা পাঠশালার পাঠারম্ভ হয়। পাঠশালার প্রধান অধ্যাপক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যুক্তিযুক্ততা এবং বাংলা যে এতদুপযোগী শক্তি-শালিনী ভাষা সে-বিষয়ে একটি দীর্ঘ সুচিন্তিত বক্তৃতা-লিপি পাঠ করেন। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র ইংরেজিতে ইহার মর্মানুবাদ করিয়া উপস্থিত ইংরেজগণকে বুঝাইয়া দেন। বাঙালি ব্যতিরেকে কয়েকজন ইংরেজ প্রধানও এই দিনে বাংলাভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ইঁহাদের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ও'সাগনেসী এবং হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। কার্যারম্ভের পর ছয় মাস যাবৎ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পাঠশালার তত্ত্বাবধায়ক বা প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পর ১ জুলাই ১৮৪০ হইতে তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) নিযুক্ত হন কলিকাতা স্কুল সোসাইটির স্কুলের (পরে হেয়ার স্কুলে পরিণত) শিক্ষক ক্ষেত্রমোহন দত্ত। তাঁহার নিয়োগে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিশেষ হাত ছিল। ক্ষেত্রমোহন

১৮৫৪ সনে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে পাঠশালার সঙ্গে তাঁহার কার্যাবসানের পরেও যুক্ত দেখিতে পাই। তিনি বাংলা ১২৪৭ সনের ২১ মাঘ হইতে পাঠশালার উচ্চ-শ্রেণীর ছাত্রদের উদ্দেশে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। 'নীতিদর্শন' নামে পুস্তকাকারে এই বক্তৃতাবলী মুদ্রিত হইয়াছে।

পাঠশালার গৃহনির্মাণের অধিকাংশ ব্যয় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা কলেজ-ভাণ্ডার হইতে দিলেন। শিক্ষকদের বেতন ও আনুষঙ্গিক খরচ-পত্রও অধিকাংশ তাঁহাদের বহন করিতে হইত। ছাত্র-বেতন হইতে অবশ্য কিয়দংশ মিটিত। ইতিপূর্বে পাঠশালার পাঠ্য বিষয়াদি সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সেই বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার ভারও কলেজ কর্তৃপক্ষ যোগ্য ব্যক্তিদের উপর অর্পণ করিলেন। রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির একটি সাধারণ নাম দেওয়া হইল 'শিশু সেবধি'। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহার অন্তর্ভুক্ত 'বর্ণপরিচয়' প্রণয়ন করেন। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক রচনার জন্যও কাহারও কাহারও উপর ভার দেওয়া হইল। এইসকল বিষয়ের কোনো-কোনোটির উপর পুস্তক রচিত হইল, কোনো-কোনো বিষয়ে রচনা অগ্রসর হইতে লাগিল। কলেজ-কর্তৃপক্ষ নিজ-ব্যয়ে নির্বাচিত মুদ্রাযন্ত্রে এ সমুদয় মুদ্রিত করাইতে আরম্ভ করিলেন। পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে উৎকৃষ্ট পাঁচ জন ছাত্র যাহাতে হিন্দু কলেজে অবেতনে পড়িতে পায় তাহারও ব্যবস্থা করা হইল। পাঠশালায় প্রদত্ত শিক্ষা অল্প দিনের মধ্যেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহা এতই জন-প্রিয় হইয়া উঠিল যে, প্রথম তিন বৎসরে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ শত ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। বারোটি শ্রেণীর জন্য তত্ত্বাবধায়ক পদে বারো জন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্যানুযায়ী বাংলাভাষার মাধ্যমেই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। বাংলা পাঠশালার

ভিতর দিয়া হিন্দু কলেজ-কর্তৃপক্ষ যখন বাংলাভাষা শিক্ষার একটি সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধ রীতি প্রবর্তন করিতেছিলেন সেই সময়েই সরকারী কার্য-কলাপ ইহার উন্নতির পথে ভীষণ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। এই কথাই এখন বলিতেছি।

হিন্দু কলেজে সরকারী কর্তৃত্ব বহুদিন পূর্ব হইতেই আরম্ভ হয়, কিন্তু ১৮৪১ সনের শেষ ভাগ হইতেই ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা হইল। এই সনের ২০ অক্টোবর তারিখে ভারত গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী জি. এ. বুসবি একটি পত্রে সরকারী সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া এই মর্মে লেখেন যে, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা Council of Education বা শিক্ষা-সমাজের অন্তর্গত একটি সেক্‌শন বা সাব-কমিটি রূপে পরিগণিত হইবে এবং শিক্ষা-সমাজের সভাপতি ও অন্য দুই জন সদস্য ইহার সদস্য হইবেন। উক্ত পত্রে একথা পরিষ্কার করিয়াই বলা হইল যে, অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সভার মত হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভাকেও প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষা-সমাজের নির্দেশ মত কার্য করিয়া যাইতে হইবে। ইহার পর কলেজ-পরিচালনা ব্যাপারে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষগণের কর্তৃত্ব আর রহিল না। হিন্দু কলেজ পাঠশালার উপর ইহার কি প্রতিক্রিয়া হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। পাঠশালা হইতে যে পাঁচ জন ছাত্র অবেতনে হিন্দু কলেজে প্রেরিত হইত, তাহা রহিত হইল। অধ্যক্ষ-সভার আনুকূল্যে পাঠশালার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা-অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের আয়োজন চলিতেছিল। ইহার পর তাহাও ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল।

শিক্ষা-সমাজ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করাইবার ভার নিজে গ্রহণ করিয়া এ সম্বন্ধে উদ্‌যোগ-আয়োজন করিবার উদ্দেশ্যে একটি সাব-কমিটি গঠন করিলেন। এই কমিটিতে একমাত্র বাঙালি সদস্য ছিলেন বাংলা-শিক্ষা-প্রসারে প্রধান উদ্‌যোগী প্রসন্নকুমার ঠাকুর। হিন্দুর আচার-আচরণ,

প্রাচ্যদর্শন বা ভাবধারা যাহাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত না হইতে পারে সেজন্য শিক্ষা-সমাজ এই নিয়ম করিয়া দিলেন যে, প্রথমে ইংরেজিতে পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া তাহা তাঁহাদের সাব-কমিটিদ্বারা অনুমোদিত করাইয়া তবে বাংলা ও অন্য দেশভাষাসমূহে অনুবাদ করাইতে হইবে। এতদনুযায়ী কার্য করার ফলে পাঠশালার আদর্শ সত্বর ব্যাহত হইল। জাতীয় ভাবাদর্শমূলক বা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত পাঠ্যপুস্তক রচনার আর আশাই রহিল না। হিন্দু কলেজের নিয়মাবলীর ৩৭ ধারা অনুসারে কলেজে ভর্তি হইবার নিম্নতম বয়স ধার্য ছিল আট বৎসর। হিন্দু কলেজের ন্যায় অন্যান্য সরকারী বিদ্যালয়েও এই নিয়ম প্রতিপালিত হইত। ইহার পর এই নিয়মটির উপরও কড়া নজর রাখা হইল।

একে তো ইংরেজি শিক্ষা অর্থকরী বিধায় উহার প্রতি সাধারণের অত্যধিক ঝোঁক, তাহার উপর পাঠশালা এবং হিন্দু কলেজের মধ্যেকার যোগসূত্র এইরূপে শিথিল হইয়া যাওয়ায় ইহার ফলও শীঘ্রই ফলিতে আরম্ভ করিল। পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা প্রথম তিন বৎসরে, ১৮৪০ সনে ৪৬০, ১৮৪১ সনে ৪৮১, এবং ১৮৪২ সনে ৪৭২ ছিল ; চতুর্থ বৎসরে, ১৮৪৩ সনে, তাহা কমিয়া দাঁড়াইল প্রায় অর্ধেকে, অর্থাৎ ২৫২ জনে। কলেজ সাব-কমিটি অর্থাৎ অধ্যক্ষ-সভা ১৮৪২-৪৩ সনেই এইরূপ শোচনীয় পরিণতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শিক্ষা-সমাজকে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন ; ১৮৪৩-৪৪ সনেও পুনরায় এইরূপ পত্র প্রেরিত হইল। ইহাতে তাঁহারা শিক্ষা-সমাজকে স্পষ্টই লিখিলেন যে, পাঠশালায় অন্তত পাঁচ বৎসর কাল অধ্যয়নে রত না থাকিলে ছেলেদের কোনো বিষয়েই মোটামুটি জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে, প্রতি বৎসরে পাঠশালায় পাঁচটি করিয়া উৎকৃষ্ট ছাত্রকে অবেতনে হিন্দু কলেজে পড়াইবার ব্যবস্থা হউক, আর সর্বোপরি হিন্দু কলেজ তথা সরকারী

বিদ্যালয়ে প্রবেশের নিম্নতম বয়স আট স্থলে বাড়াইয়া দশ করা হউক। পাঠশালার উন্নতিকল্পে এবং নিয়মিতভাবে বাংলাভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে এইরূপ সংস্কার ও ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা বাংলা শিক্ষা তথা বাংলা পাঠশালার অবনতি অনিবার্য। শিক্ষা-সমাজ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, মাত্র তৎকালীন বাংলা শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের আয়োজন করিয়া নিজ কর্তব্য সমাধা করিলেন।

বাংলা পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাইতে লাগিল। ১৮৪৩-৪৪ সনে ছাত্রসংখ্যা দেড়শতের কিছু উপরে গিয়া দাঁড়াইল। শ্রেণী-সংখ্যা ক্রমে কমিয়া গিয়া বারো স্থলে সাত হইল, শিক্ষক-সংখ্যাও স্বতঃই কমিয়া গেল। ছাত্র, শ্রেণী এবং শিক্ষক-সংখ্যা হ্রাস পাইলেও যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাতেও বাংলা শিক্ষা ভালোরূপই হইতে লাগিল। প্রতি বৎসর হিন্দু কলেজের কোনো-না-কোনো শিক্ষক ছাত্রগণের পরীক্ষা লইতেন। ১৮৪৮-৪৯ এবং ১৮৪৯-৫০ এই দুই বৎসরে পাঠশালার ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন হিন্দু কলেজের সিনিয়র বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র। তিনি দুই বৎসরেই ছেলেদের বাংলাপাঠে উৎকর্ষ দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করেন, কিন্তু পূর্বোক্ত যেসব নিয়ম বাতিল হওয়ায় পাঠশালার ক্রমশ অবনতি ঘটিতেছিল, মিত্র-মহাশয় শিক্ষা-সমাজকে তাহা পুনরায় প্রবর্তনের আবেদন জানাইলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অচল, অটল; তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইতে এক চুলও নড়িলেন না। পাঠশালার ক্রমিক অবনতি সম্বন্ধে বাহিরেও আলোচনা চলিতে থাকে। 'বেঙ্গল হরকরা' ২৯ অগস্ট ১৮৫১ সংখ্যায় লেখেন, "The Hindu College Patshalla is in its present state nothing better than the common patshallas conducted by gooroomahasayas..." অর্থাৎ, হিন্দু কলেজ পাঠশালা বর্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহাকে গুরুমহাশয়ের পরি-

চালিত যে-কোনো সাধারণ পাঠশালার চেয়ে উর্ধ্বে স্থান দেওয়া যায় না।

পাঠশালার তত্ত্বাবধায়ক ক্ষেত্রমোহন দত্তের মৃত্যু হইলে গোপালচন্দ্র বসু ১৮৫৪ সনে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। পাঠশালার শিক্ষকদের মধ্যে সে যুগের কয়েকজন নামজাদা পণ্ডিতও ছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলা পাঠশালার পরিকল্পনা হইতেই কিছুকাল যাবৎ ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আমরা জানিতে পারিয়াছি। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, হরানন্দ ভট্টাচার্য প্রমুখ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এখানে শিক্ষকতা করেন। হরানন্দ ভট্টাচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা।

ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজ-সম্পর্কে কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ-সভা এবং শিক্ষা-সমাজের মধ্যে কলেজ-সংক্রান্ত নানা বিষয় লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা ও বাদ-প্রতিবাদ শুরু হইল। ফলে শিক্ষা-সমাজ কলেজ-পরিচালনার ভার প্রায় সবটাই নিজ হাতে লইলেন। সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল ১৮৫৪ সনে তাহাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া হিন্দু কলেজের একেবারে রূপান্তর ঘটিল। ১৫ মে ১৮৫৪ ইহার কলেজ-বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়, স্কুল-বিভাগ হিন্দু স্কুল নাম পরিগ্রহ করে। বাংলা পাঠশালা সংস্কৃত কলেজের অন্তর্ভুক্ত হইল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষরূপে ১৮৫৫ সনের ৩০ এপ্রিল শিক্ষা-সমাজের পক্ষে ইহার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলেন।

পাঠশালার পরবর্তী ইতিহাসও এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবার পর পাঠশালার আবার উন্নতি হইতে থাকে। ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। নূতন পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হইল। বহুদিন ধরিয়া পাঠশালা সাত শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, এবং তত্ত্বাবধায়ক ব্যতিরেকে শিক্ষকও সাত জন মাত্র ছিলেন। ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আট শ্রেণী করা হইল, দুই জন নূতন শিক্ষকও নিযুক্ত হইলেন। ছাত্রদের বার্ষিক পুরস্কারের বরাদ্দ কুড়ি

টাকার স্থলে বর্ধিত করিয়া চল্লিশ টাকা করা হইল। ১৮৫৬-৫৭ সনে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং ছেলেদের পরীক্ষা লইলেন। ইতিপূর্বেই শিক্ষা-সমাজ উঠিয়া গিয়া 'Director of Public Instruction' নামে শিক্ষা-বিভাগের একজন কর্ণধার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার নিকটে পাঠশালার যে বিবরণ দেন তাহাতে উপরোক্ত উন্নতি ও সংস্কারের কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, পাঠশালার সুনাম বৃদ্ধির দরুন প্রতি ছেলের মাসিক বেতন আট আনার স্থলে বারো আনা করিলেও ছাত্রসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়াই চলিয়াছে। সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছেলেদের পরীক্ষা করিয়া তাহাদের পাঠোন্নতিতে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন।

সংস্কৃত কলেজে অক্ষয়কুমার দত্তের অধ্যক্ষতায় যে নর্মাল স্কুলের কার্য আরম্ভ হয়, বাংলা পাঠশালা তাহার সহকারীরূপে কার্য করিতে থাকে। বাংলা পাঠশালার গৃহ ভাঙিয়া আবার নূতন করিয়া নির্মাণ করিবার প্রয়োজন হয়। তখন হিন্দু কলেজের সন্নিকট একটি বাটী ভাড়া করিয়া সেখানে ইহার কার্য চলিতে থাকে। পরে, ১৮৫৭-৫৮ সনের শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে দেখিতেছি, সেখান হইতে বৌবাজার স্ট্রীটের একটি গৃহে ইহা স্থানান্তরিত হয়। নর্মাল স্কুলও ১৮৬০ সনের মধ্যে এই বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে। কারণ ১৮৬০-৬১ সনের রিপোর্টে আছে, নর্মাল স্কুল ও পাঠশালা ১৮৬০ সনের ১ জানুয়ারি বৌবাজার স্ট্রীট হইতে চিৎপুর রোডে শ্যামাচরণ মল্লিকের প্রশস্ততর ভবনে উঠিয়া যায়। এই সময় বাংলা পাঠশালার একটি নূতন নিয়ম হয়। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের ঝোঁকের কথা তো আমরা জানিতে পারিয়াছি। বাংলা পাঠশালায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের কথা উঠিলে ছাত্রদের অভিভাবকদের অধিকাংশের নিকট হইতে এ সম্পর্কে ভোট লওয়া হইল। শতকরা নব্বই জন অভিভাবক পাঠশালায় ইংরেজি

শিক্ষা প্রবর্তনের অনুকূলে মত দিলেন। ইহার পর পাঠশালায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। তবে ইহার জন্য খুব কম সময়ই দেওয়া হইতে থাকে। বাংলা শিক্ষার জন্যই সময় দেওয়া হইত সকলের চেয়ে বেশি। এরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় এই সুফল ফলিল যে, ইংরেজি বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে ছাত্রদের আর ভর্তি হইতে হইত না। অন্যান্য বিষয় বাংলার মাধ্যমে বেশি আয়ত্ত হওয়ায়, কম ইংরেজি জানিলেও, তাহা শীঘ্রই পূরণ করিয়া লইতে পারিত। একমাত্র বাংলা শিক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত একটি বাংলা পাঠশালার এরূপ পরিণতি ঘটিল। বাংলা পাঠশালার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আর-একটি বিদ্যালয়ের কথা এখন বলিব।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা

হিন্দু কলেজ পাঠশালার অন্যতম উদ্যোক্তা দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার আদর্শে তৎপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে ১৩ জুন ১৮৪০ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন। কলিকাতা সিমলা পল্লীর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা-বাটী ভাড়া লইয়া তথায় কিয়ৎকাল তত্ত্ববোধিনী সভা ও পাঠশালা উভয়েরই কার্য সমাধা হইতে থাকে। উন্নত ধরনের পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলা শিক্ষার সুষ্ঠু আয়োজনের ইহা আর-একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম হইতেই এই পাঠশালায় শিক্ষকতা-কার্যে ব্রতী হন। হিন্দু কলেজ পাঠশালার ন্যায় এই পাঠশালাটির পাঠ্যপুস্তক রচনায়ও বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ এবং শিক্ষক অক্ষয়কুমার নিজেরাই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে মন দিলেন। অক্ষয়কুমার ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে পাঠ্যপুস্তক লিখেন।

ধর্মশিক্ষা পাঠশালার পাঠ্যবিষয় ভুক্ত হইল। প্রতিটি বিষয়ই বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। সংস্কৃতও এখানকার

অধীতব্য বিষয় মধ্যে গণ্য হইত। প্রাতে ৬টা হইতে ৯টা পর্যন্ত পাঠশালা বসিত, কারণ এরূপ ক্ষেত্রে ছেলেদের পক্ষে দ্বিপ্রহরে অন্য বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিখিবার সুবিধা হইত। তখন ইংরেজি শিখিবার খুবই ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। এখানে সকালে পড়িয়া দুপুরে ইংরেজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা অল্পবয়স্ক ছেলেদের পক্ষে বড়ই শ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল, এ কারণ এখানকার ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পায়। তখন এখানেও ইংরেজি শিখাইবার ব্যবস্থা হইল।

কলিকাতায় স্কুল-পাঠশালা বিস্তর। কাজেই বিদ্যালয়টি এখান হইতে পল্লী অঞ্চলে লইয়া গেলে দেশবাসীর প্রকৃত উপকার হয়, পাঠশালার উদ্দেশ্যও সম্যকরূপে পরিপূরিত হইবার সম্ভাবনা থাকে—এই বোধে দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন বৎসর পরে ১৮৪৩ সনের ৩০ এপ্রিল তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাটিকে হুগলীজেলার অন্তর্গত বংশবাটী (বা বাঁশবেড়িয়া) গ্রামে স্থানান্তরিত করেন। এই দিনে সেখানে দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। দেবেন্দ্রনাথ বক্তৃতায় ধর্মশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়া বলেন, "পরমার্থ এবং বৈষয়িক উভয় বিদ্যারই উপদেশ প্রদান করা যাইবে।" অক্ষয়কুমার দত্তও একটি সুচিন্তিত বক্তৃতায় হিন্দু এবং খ্রীস্টানদের মধ্যে জাতি ও ধর্ম সংঘাতের প্রতি স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই কথা দ্বারা উহার উপসংহার করেন, "এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের ও ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১২৬৫ সালের ১৮ বৈশাখ রবিবার এতৎ পাঠশালা-রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।" অক্ষয়কুমার কলিকাতা ত্যাগে অসমর্থ হওয়ায় ঐ স্থানের অধিবাসী শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ পাঠশালার প্রধানশিক্ষক নিযুক্ত হন।

বংশবাটীতে স্থানান্তরের পর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উত্তরোত্তর উন্নতি

হইতে থাকে। প্রতি বৎসর সাম্বৎসরিক পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণোৎসব-কালে কলিকাতা হইতে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এবং স্থানীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্যেরা আসিয়া যোগ দিতেন। ১৮৪৫ সনে ইহার ছাত্রসংখ্যা হইল ১২৭ জন। পাঠশালা ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা এবং পাঠ্য বিষয়ের বর্ণনা এইরূপ পাওয়া যাইতেছে। ইংরেজিও পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল:

প্রথম শ্রেণী ॥ ৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ: কঠোপনিষৎ রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চুম্বক। তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা। ব্যাকরণ। পদার্থবিদ্যা। অঙ্ক। ইংরেজি পাঠ্য গ্রন্থ: Reader No 4, Poetical Reader No 2, Grammar, History of Bengal।

দ্বিতীয় শ্রেণী ॥ ১৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ: ব্যাকরণ। জ্ঞানার্ণব। ভূগোল। অঙ্ক। ইংরেজি পাঠ্য গ্রন্থ: Reader No 3, Poetical Reader No 1, Grammar, History of Bengal।

তৃতীয় শ্রেণী ॥ ২৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ: বর্ণমালা ২য় ভাগ। মনোরঞ্জন ইতিহাস। ভূগোল। অঙ্ক। ইংরেজি পাঠ্য গ্রন্থ: Reader No 1, Spelling No 2।

চতুর্থ শ্রেণী ॥ ২০ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ: নীতিকথা ২য় ভাগ। বর্ণমালা ২য় ভাগ। অঙ্ক। ইংরেজি পাঠ্য গ্রন্থ: Reader No 1, Spelling No 2।

পঞ্চম শ্রেণী ॥ ২৯ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ: নীতিকথা ১ম ভাগ। বর্ণমালা ১ম ভাগ। অঙ্ক। ইংরেজি পাঠ্য গ্রন্থ: Easy Primer।

ষষ্ঠ শ্রেণী ॥ ৩৬ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ: বর্ণমালা ১ম ভাগ। অঙ্ক। ইংরেজি পাঠ্য গ্রন্থ: Easy Primer।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পঠনরীতি এবং ছাত্রদের শিক্ষায় উৎকর্ষ সে যুগে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এমনকি, শিক্ষা-সমাজও (Council of Education) ১৮৪৫-৪৬ সনের রিপোর্টে এই পাঠশালার বিষয় উল্লেখ করেন। পাঠশালার কার্য অতিশয় কৃতিত্বের সহিত চলিলেও ১৮৪৮ সনে ইহার ভাগ্যবিপর্যয় উপস্থিত হইল। এই বৎসরে কার্ ঠাকুর কোম্পানি এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কারবার বন্ধ করিয়া দিলে পাঠশালার প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সবিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন। উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দ্বারা ইহাকে রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। পাঠশালাটি উঠিয়া গেল। উহার স্থানে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ কালক্ষেপ না করিয়া একটি মিশনরী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন।

হিন্দু কলেজ পাঠশালার আদর্শে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ন্যায় দেবেন্দ্র-নাথের অর্থানুকূল্যে ১৮৪৬ সনে বারাকপুরে আর-একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপিত হয়। পাঠ্যপুস্তকও ছেলেদের বিনামূল্যে দেওয়া হইত। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বিস্তর ছাত্র আসিয়া এখানে অধ্যয়ন করিত। নদীয়া জেলায় সুখসাগরেও দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্তী মুন্সেফ কাশীশ্বর মিত্র আর-একটি বিদ্যালয় উক্ত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জনশিক্ষা-কল্পে বেসরকারী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইহাদের স্থানও অতি উচ্চে।[১৮]

---

[১৮] বর্তমান লেখকের 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' পুস্তকে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য

অ্যাডাম তাঁহার শেষ রিপোর্টে তৎকালীন সরকারী নীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে এই মর্মে লেখেন যে, এদেশে সাধারণ শিক্ষার যেসব আয়োজন আছে তাহাকে ভিত্তি করিয়াই জাতীয় শিক্ষা-সৌধ গড়িতে হইবে। পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিয়া উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে ক্রমান্বয়ে থানা মহকুমা ও জেলার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়সমূহে পাঠাইতে হইবে। আবার জেলার বিদ্যালয়সমূহে যাহারা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে তাহারা রাজধানীর মহাবিদ্যালয়ে পড়িবার সুবিধা পাইবে। এই ব্যবস্থায় একদিকে যেমন দেশের দরিদ্রতম অধিবাসীরাও সাধারণ শিক্ষার আস্বাদ পাইবে অন্যদিকে তেমনি উৎকৃষ্টতর ছাত্রগণ উচ্চতম শিক্ষালাভ করিয়া দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণপূর্বক নিজেদিগকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবে।

কিন্তু তখন বঙ্গদেশে শিক্ষা-পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর ছিল সেই শিক্ষা-সমাজ ইংরেজি শিক্ষা প্রচারে একান্ত তৎপর হইয়াছিলেন। নিজেরা নূতন নূতন ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং এদেশবাসীদের দ্বারা ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় চরিতার্থ করিতে লাগিয়া গেলেন। অ্যাডামের উপদেশ বা পরামর্শ তখন তাঁহাদের মনে ধরিল না, জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি যে পাঠশালা তাহাও অনাদৃত রহিয়া গেল। বাংলা বা দেশভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই হইল না। ইংরেজি বিদ্যালয়সমূহে বাংলা রচনা শিক্ষার কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পিত্তি রক্ষা করা হইল মাত্র। বেসরকারীভাবে বাংলা শিক্ষার যেসব আয়োজন হইয়াছিল সরকারী প্রতি-কূলতা হেতু তাহার উন্নতি হইতে পারিল না। জনশিক্ষাকল্পে গবর্ন-

পঠন এবং বাংলায় গণিত, ভূগোল, ভারতবর্ষ ও বাংলার ইতিহাস পড়ানো সাব্যস্ত হইল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মাসিক বেতন দিতে এবং নিজ-ব্যয়ে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে— নির্দেশপত্রে ইহাও বলা হয়। কোথায় কতসংখ্যক বিদ্যালয় থাকিবে তাহাও নিম্নরূপ ধার্য হইল :

মুর্শিদাবাদ বিভাগ	
মুর্শিদাবাদ	৩
বীরভূম	৩
রংপুর	৩
রাজশাহী	৩
পাবনা	৩
বগুড়া	২
মোট	১৭

ভাগলপুর বিভাগ	
ত্রিহুত	৩
মুঙ্গের	৩
ভাগলপুর	৩
পুর্ণিয়া	৩
দিনাজপুর	৩
মালদহ	২
মোট	১৭

ঢাকা বিভাগ	
ঢাকা	৩
ময়মনসিংহ	৩
শ্রীহট্ট	৩
বাখরগঞ্জ	৩
ফরিদপুর	৩
মোট	১৫

পাটনা বিভাগ	
পাটনা	৩
বেহার	৩
সাহাবাদ	৩
সারণ	৩
চম্পারণ	২
মোট	১৪

মেণ্টের পক্ষ হইতে এতদিন কোনো চেষ্টাই হয় নাই। এবিষয়ে সরকারী প্রথম প্রচেষ্টা বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮) প্রতিষ্ঠিত এক শত একটি বঙ্গবিদ্যালয়। হার্ডিঞ্জ বিলাতী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এই নির্দেশ লইয়া আসেন যে, ভারতবাসীদের হিতার্থ বিভিন্ন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের চিত্ত জয় করিতে হইবে। হার্ডিঞ্জ এদেশে আসিয়া দেখিলেন যে, জনশিক্ষার জন্য সরকারী কোনো ব্যবস্থাই নাই। তিনি এই অভাব পূরণকল্পে ১৮৪৪, ১৮ ডিসেম্বর বঙ্গপ্রদেশে (বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায়) উক্ত সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আদেশ দিলেন। বাংলাদেশে এই বিদ্যালয়গুলি বঙ্গবিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। ইহার অর্থও ছিল। এই বিদ্যালয়গুলি ছিল আদর্শ পাঠশালা, এখানে বাংলা তথা দেশভাষার মাধ্যমে সকল বিষয় পঠনপাঠনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আবার সরকারী নথিপত্রে 'হার্ডিঞ্জ স্কুল' নামেও এই বিদ্যালয়সমূহ অভিহিত হইয়াছে। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মত সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের পক্ষে মাত্র এক শত একটি বিদ্যালয় বা আদর্শ পাঠশালা মোটেই যথেষ্ট নয়; তবে সরকার যে জনসাধারণের শিক্ষার আংশিক দায়িত্ব গ্রহণে অবহিত হইয়াছেন ইহাতে সকলেই, বিশেষত সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, বিশেষ আশ্বস্ত হন। এই এক শত একটি বিদ্যালয়-স্থাপনকল্পে যে নির্দেশপত্র প্রদত্ত হয় তাহা শিক্ষা-সমাজের ১৮৪৪-৪৫ সনের রিপোর্টভুক্ত হইয়া আছে।

এই নির্দেশপত্র হইতে জানা যায়, এক শত একটি বিদ্যালয়ের জন্য ঐ সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগেরও ব্যবস্থা হয়। শিক্ষকগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রথম শ্রেণীতে কুড়ি জন, প্রত্যেকের বেতন মাসে পঁচিশ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ত্রিশ জন, বেতন মাসিক কুড়ি টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীতে একান্ন জন, বেতন মাসিক পনের টাকা। প্রতিমাসে বেতন বাবদে ১,৮৬৫ টাকা ব্যয় ধরা হয়। বিদ্যালয়সমূহে বাংলা লিখন

যশোহর বিভাগ

যশোহর	৩
নদীয়া	৩
২৪ পরগনা	৩
হুগলী	৩
বর্ধমান	৩
বারাসত	২
বাঁকুড়া	২
মোট	১৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম	৩
ত্রিপুরা	৩
ভুলুয়া	২
মোট	৮

কটক বিভাগ.

মেদিনীপুর	৩
কটক	৩
বালেশ্বর	৩
খুরদা	২
মোট	১১

প্রতিটি জেলায় যথানির্দিষ্ট স্থানে উক্ত আদর্শ-বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইল। এইসকল বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার পড়িল 'সদর বোর্ড অফ রেভিনিউর' উপর। কাউন্সিল অব্ এডুকেশন বা শিক্ষা-সমাজ ইংরেজি শিক্ষা লইয়াই মশগুল; তাই হার্ডিঞ্জ মহোদয় ইঁহাদের দ্বারা বাংলা শিক্ষার উৎকর্ষ বা বিস্তার সাধন সম্পর্কে হয়ত সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু এই শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাদ্বারাও ফল বিশেষ ভালো হইল না। উপযুক্ত পরিচালক, পরিদর্শক ও পাঠ্যপুস্তকের অভাবে তিন চার বৎসরের মধ্যেই এগুলির দুর্দশা দেখা দিল। বস্তুত বাংলা শিক্ষার প্রতি কর্তৃপক্ষের একান্ত ঔদাসীন্যই ইহার একমাত্র কারণ। মনস্বী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ১৮৪৮, ১ জুন হেয়ার-স্মৃতি সভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় এই বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থা সম্বন্ধে বলেন :

"পূর্বোক্ত একশত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? তাহার দুরবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে, সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের

লেশমাত্রও যত্ন নাই, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাহাদের অভিপ্রায় নহে। এইসকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাহাদের যেরূপ উৎসাহ, তাহা চিন্তা করিলেই তাহাদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়। তাহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত প্রচুর ধন ব্যয় করেন তাহার তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে বহু মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু পূর্বোক্ত ঐ এক শত বাঙ্গালা পাঠশালার প্রতি তাহাদিগের যত্নের কি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে! গ্রন্থ নাই শিক্ষা নাই এবং তাহার তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই অথচ তাহার কার্য্য সফল হইবেক ইহা অপেক্ষা অলীক কথা আর কি হইতে পারে? একজন সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালা সকল গভর্ণমেণ্টের আপন সন্তান, আর বাঙ্গালা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান। আত্মসন্তানের ন্যায় সপত্নীসন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে?" [১৯]

এই বিদ্যালয়গুলি ১৮৫২, ১৯ এপ্রিল শিক্ষা-সমাজের কর্তৃত্বাধীনে আসে। তখনও ইহাদের অত্যন্ত হীন অবস্থা। শিক্ষা-সমাজের ১৮৫১-৫২ সনের রিপোর্টে এ বিষয় এরূপ বর্ণিত আছে :

"In April last [1852, 19 April] the vernacular schools were transferred from the charge of the Sudder Board of Revenue to that of the Council. Immediately on taking charge, circular No. 4 of 1852 was addressed to the different collectors, calling for information upon the actual present state of all these Institutions. ...most of the schools appear to be in a languishing state, and not to have fulfilled the expectations formed on their establishment."

---

১৯ লেখকের 'রাজনারায়ণ বসু' পৃ ৩০-১ দ্রষ্টব্য

ইহার কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পরে ১৮৫৪ সনের ১৯ জুলাই যে বিখ্যাত শিক্ষা-বিষয়ক ডেসপ্যাচ বিলাত হইতে এদেশে প্রেরিত হয় তাহাতে প্রকাশ, ঐ সময় মাত্র তেত্রিশটি হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয় বর্তমান ছিল এবং তাহাতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৪০০ জন। ইহার পর শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। ইহার ফলে অবশিষ্ট বিদ্যালয়গুলির অবস্থা কিঞ্চিৎ ভালো হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। মধ্যবঙ্গের স্কুল ইন্সপেক্টর ১৮৬৩, ৩০ মে তারিখে প্রদত্ত রিপোর্টে পাঁচটি হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয় সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন:

"The five Hardinge vernacular schools now contain 510 boys and show an increase of 89 due chiefly to an increase at Mojilpur and 26 at Ooterparah. Burra Jagoolia has suffered much from pestilence, otherwise the advance would have been greater."

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনীতে উক্ত মজিলপুর বিদ্যালয়ের একাধিকবার উল্লেখ আছে। তাঁহার পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য বাংলা পাঠশালার কার্যকাল অন্তে এই বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। শিবনাথ শৈশবে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত বানড়ীপাড়া গ্রামে একটি হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম কয়েক বৎসর ব্রজমোহন দত্ত ইহার প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। এই ব্রজমোহন দত্ত অনুমান হয় সুবিখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্তের পিতা। ব্রজমোহন পরবর্তীকালে সবজজ হইয়াছিলেন।
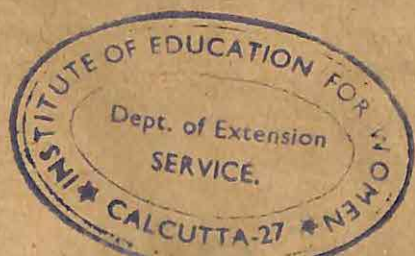
জনশিক্ষায় সরকার

বঙ্গে হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়গুলির অবস্থা যখন ক্রমশ খারাপ হইয়া পড়িতেছিল সেই সময় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ছোটলাট টোমাসন-প্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। সপরিষদ বড়লাট বাংলা গবর্নমেণ্টকে লিখিলেন যে, বঙ্গ ও বিহারে এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে নির্দেশ দিলেন। শিক্ষা-সমাজ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য নিজ সম্পাদককে প্রেরণ করেন। তথাকার শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিয়া শিক্ষা-সমাজ ১৮৫৩ সনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে, পরীক্ষাস্বরূপ প্রতি জেলায় চারিটি মডেল স্কুল বা আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রতি জেলায় শিক্ষকদের পাঠন-প্রণালী শিক্ষাদান ও স্কুল পরিদর্শনের জন্য আবশ্যক লোক নিয়োগ, উৎকৃষ্ট ছাত্রদের পুরস্কৃত করা, স্কুলে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের অবস্থা ও প্রয়োজনের উপযোগী ক্রমিক উন্নতিশীল একই ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করা আবশ্যক। এই প্রস্তাব অনুযায়ী সত্বর কি ভাবে কার্য আরম্ভ করিতে হইবে তাহারও কতকগুলি উপায় সাব্যস্ত করিয়া দেন।

শিক্ষা-সমাজের এই প্রস্তাব সম্পর্কে উহার যেসব সদস্য আগ্রহের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের মধ্যে স্যার্ ফ্রেডারিক হ্যালিডে ছিলেন সকলের অগ্রণী। তিনি সাধারণভাবে বাংলা শিক্ষা এবং দেশীয় বাংলা পাঠশালাগুলির দ্রুত উন্নতি কিরূপে সম্ভব সে সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর নিজ অভিমত হ্যালিডে সাহেবকে

একটি পরিকল্পনার আকারে লিখিয়া জানান। হ্যালিডে ইহার যুক্তিযুক্ততা সম্যক উপলব্ধি করিয়া ইহাকেই বাংলা শিক্ষা তথা বাংলা পাঠশালার উন্নতির সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, তিনি ইতিমধ্যে প্রথম ছোটলাট রূপে ১ মে ১৮৫৪ তারিখে এই পদে সমাসীন হইলেন। তাঁহার নির্দেশে বাংলা গবর্নমেণ্ট ভারত-সরকারের নিকট ১৮৫৪, ১৬ নবেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী কার্যারম্ভের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইহার মধ্যেই বিলাত হইতে ১৯ জুলাই ১৮৫৪ তারিখের বিখ্যাত শিক্ষা-বিষয়ক ডেস্‌প্যাচ এদেশে আসিয়া পৌছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের ইংরেজ-অধিকৃত সকল প্রদেশের উচ্চ মধ্য নিম্ন ব্যবহারিক সাধারণ সকলপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও নির্দেশ এবং সরকারী শিক্ষা-বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাব ছিল। এতাদৃশ ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কার্য আরম্ভ করিতে গেলে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনার কিঞ্চিৎ অদল-বদল প্রয়োজন, তৎসত্ত্বেও ভারত-সরকার উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য আরম্ভ করিতে স্থানীয় সরকারকে অনুমতি দান করিলেন।

বিদ্যাসাগরমহাশয়ের পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়া সরকারী জনশিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতে শুরু হয়। একারণ ইহার সারমর্ম এখানে প্রদত্ত হইল। তিনি প্রথমেই শিক্ষণীয় বিষয়গুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তদনুযায়ী তাঁহার নিজের, অক্ষয়কুমার দত্ত ও তৎকালীন অন্যান্য খ্যাতনামা গ্রন্থকারের শিশুপাঠ্য গ্রন্থসমূহকে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করিয়া লইলেন। বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রনীতি, শারীরতত্ত্ব পর্যন্ত পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহার পর শিক্ষক নির্বাচন এবং তাঁহাদের বেতনাদির বিষয় উত্থাপন করিলেন। যাহাতে শিক্ষক নিজ বিদ্যালয়ে বসিয়াই নির্দিষ্ট বেতন মাস মাস পান তাহার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। হুগলী নদীয়া বর্ধমান মেদিনীপুর এই চারিটি

জেলায় তিনি পরীক্ষামূলকভাবে পঁচিশটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। নগর ও পল্লীর এমন স্থানে বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যাহার নিকটে কোনো ইংরেজি স্কুল বা কলেজ থাকিবে না, কারণ ইংরেজি কলেজ ও স্কুলের আশেপাশে বাংলা শিক্ষা ঠিকভাবে আদৃত হয় না।

ইহার পর তিনি তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দুই জন তত্ত্বাবধায়ক থাকিবেন— একজন মেদিনীপুর ও হুগলীর জন্য, অন্য জন নদীয়া ও বর্ধমানের জন্য। ইঁহাদের কর্তব্য হইবে ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন, শ্রেণীগুলির পরীক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধন। প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হইবেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং। প্রত্যেকের বেতন ও রাহাখরচের বিষয়েরও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি নিজে বেতন লইবেন না, মাত্র রাহাখরচ লইবেন। তবে স্কুলগুলির পরিচালনভার থাকিবে কর্তৃপক্ষের উপর। গ্রন্থ-প্রণয়ন, এবং পুস্তক ও শিক্ষক নির্বাচনের ভার প্রধান তত্ত্বাবধায়কের উপর থাকিবে। সংস্কৃত কলেজ বাংলা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল, বাংলা শিক্ষক প্রস্তুতের জন্য ইহা নর্মাল স্কুলে পরিণত হইবে। এখানে বলা আবশ্যক যে, অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রধানশিক্ষক করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় এখানে একটি নর্মাল স্কুলও স্থাপন করিলেন (১৭ জুলাই, ১৮৫৫)। স্থানের অসংকুলান হওয়ায় স্কুল সকালে দুই ঘণ্টা বসিত। বাংলা পাঠশালা সম্পর্কে এই নর্মাল স্কুলের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় আদর্শ বাংলা বিদ্যালয় সম্পর্কে প্রধানত এসকল ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলেও প্রচলিত দেশীয় পাঠশালাগুলির কথাও ভুলিয়া যান নাই। তিনি তত্ত্বাবধায়কদের উপর এ সমুদয় পাঠশালা পরিদর্শন, নূতন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং শিক্ষাদান রীতি সম্বন্ধে উপদেশ দানের প্রস্তাবও এই সঙ্গে করিলেন।[২০]

---

২০ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য

পূর্বোক্ত এডুকেশন ডেস্‌প্যাচ অনুযায়ী শিক্ষা-বিভাগের সংস্কার সাধিত হয়। বাংলা সরকার ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনের উপর শিক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ভার অর্পণ করিলেন। ছোটলাট হ্যালিডের আগ্রহাতিশয়ে নূতন ব্যবস্থা সত্ত্বেও বাংলা শিক্ষা প্রবর্তন ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই কর্তৃত্ব দেওয়া হইল। এই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে জনশিক্ষাকল্পে গবর্নমেণ্টের কার্যকর প্রচেষ্টার সূচনা হয়।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ
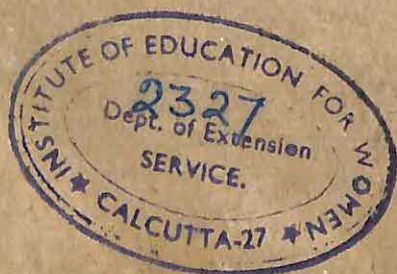
। ১৩৫২ ।
৩৭. হিন্দু সংগীত : প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : সুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ ।
৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭. ভারতের বনৌষধি : ডক্টর শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮. উপনিষদ্ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯. শিশুর মন : ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী
৬০. প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা : ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

। ১৩৫৪ ।
৬১. ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬২. ভারতশিল্পের মূর্তি : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৩. বাংলার নদনদী : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪. ভারতের অধ্যাত্মবাদ : ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫. টাকার বাজার : শ্রীঅতুল সুর
৬৬. হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

। ১৩৫৫ ।
৬৭. শিক্ষাপ্রকল্প : শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
৬৮. ভারতের রাসায়নিক শিল্প ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
৬৯. দামোদর পরিকল্পনা : ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০. সাহিত্য-মীমাংসা : শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
৭১. দূরেক্ষণ : শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২. তেল আর ঘি : শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়